ফরাসী গল্পগুচ্ছ

(মোপাসাঁ ও দদে)



শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত, এম, এ

প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী

প্রথম সংস্করণ
১৯৪২
মূল্য—১৸০

কলিকাতা ২২।৩এ, গ্যালিফ্ ষ্ট্রীট, ইষ্ট ইণ্ডিয়া আর্ট প্রেস
হইতে শ্রীসুশীলকুমার মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আমার কথা

ফরাসী ভাষায় একটা কথা আছে L'art de Conter est essentiellement Frenchais—ইহার ইংরেজি অর্থ The art of Story-telling is essentially French. এ উক্তি মিথ্যা নয়।

ফরাসী গল্পগুচ্ছের প্রথম পাঁচটা আলফোঁস দদের, বাকীগুলি গি ছ মোপাসাঁর। দদের গল্পগুলি ১৮৬৬ খৃঃ অব্দের রচনা, মোপাসাঁর গল্পগুলি ১৮৭২ খৃঃ অব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ের রচনা। এদিক দিয়ে তাদের একত্র সমাবেশের একটা সার্থকতা আছে।

ভাষান্তরিত বিষয়বস্তুর কোথাও কোথাও সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করা হয়েছে ভাষার দিক দিয়ে। কিন্তু মূল লেখার প্রতি বিশ্বস্ততা সে জন্য যাতে নষ্ট না হয় তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বিষয়বস্তু মূল লেখায় যা ছিল এখানেও তাই আছে। তা ছাড়া যে সকল স্থানে মূল লেখকের রচনা সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশ, বর্ত্তমান অনুবাদ মূল ফরাসী থেকে সেগুলির অপরিবর্ত্তিত রূপ। দদের গল্পগুলি সবই মূল ফরাসী থেকে, মোপাসাঁর গল্পের কিছু ইংরেজী অনুবাদ থেকে।

প্রথম ফরাসী শিখেই স্বাদ পেয়েছিলাম দদের গল্পের। তাই দীর্ঘদিনেও তাকে ভুলতে পারিনি। মোপাসাঁকে পেয়েছিলাম বহু

পূর্ব্বেই ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে। সেদিনই তাকে ভাল লেগেছিল। তাই বর্ত্তমান সংখ্যা এদের দুজনকে নিয়েই বা'র হ'ল। বর্ত্তমান যুদ্ধজনিত জটিলতা দূর হ'লে পরবর্ত্তী সংখ্যায় অন্যান্য ফরাসী লেখকের আলোচনা করব ইচ্ছা আছে। ইতি—

১০, ডিকসন লেন,
২৬ শে অগ্রহায়ণ
১৯৪২

শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত



নক্ষত্র রাজি

লিবেরনএ আমি নিয়েছিলাম মেষ রক্ষার ভার। ক্রমাগত কয়েক সপ্তাহ ধ'রেই তখন আমাকে পাহাড়ের উপর থাকতে হত। এই দীর্ঘকাল কোন মানুষের মুখ দেখা প্রায়ই আমার ভাগ্যে ঘটে উঠতনা। এই নির্জ্জন জীবনে আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল নিরীহ একপাল মেষ এবং আমার বিশ্বস্ত কুকুর লেব্রী। উর পর্ব্বত থেকে দুই একজন সন্ন্যাসী সময়ে সময়ে এই পথ দিয়ে নেমে আসত, পিডমণ্ট এর কয়লাব্যবসায়ীদের মধ্যেও কেউ কেউ কখনও কখনও কি কারণে জানিনা আসত এখানে কিন্তু এরা যেমনি আসত তেমনি চলে যেত। এদের যাওয়াআসা আমার নিঃসঙ্গ জীবনের পক্ষে ছিল একান্তই নিরর্থক। সহরে কিম্বা গ্রামের কর্ম্মময় জীবনের কোন স্পন্দন কোন দিন এরা আমার নিকট বহন করে আনেনি এইটেই আমি জানি। শুধু পনের দিন পরে একবার ক'রে আমার নীচের সংবাদ মিলত। কারখানার গাড়ী সেদিন উপরে আসত। কি অধীর উৎকণ্ঠা নিয়ে আমি এই দিবসটীর জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম তা প্রকাশ করবার সাধ্য আমার নেই। দূর থেকে আমি দেখতাম হয়ত গাড়ীর উপরে বালক মিয়ারোর খালি মাথা, নয়তবা নোরেদ মাসীর কালো টুপি, সমস্ত মনটা আমার এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠত। গাড়ীর আসার জন্য অপেক্ষা করা আমার পক্ষে প্রায়ই সম্ভব হত না, শব্দ শুনলেই কিছুদূর এগিয়ে যেতে চাইত মন। নীচথেকে তারা

কত সংবাদ নিয়ে আসত, কত কি আমি নিজে তাদের কাছে কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতাম কিন্তু তবু একটি কথা আমি কিছুতেই সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারতুম না—আর সেইটী জানার জন্যই আমার ঔৎসুক্য ছিল সবচেয়ে বেশী। প্রভুকন্যা ষ্টিফানেত-কে আমি নীচে থাকতে প্রায়ই দেখেছি—সন্ধ্যা বেলা সে বেড়াতে যেত, সাজসজ্জা চাল চলন তার যেন গর্ব্বভরা। যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করত এই সংবাদের জন্য তুমি এমন উৎসুক কেন, একমাত্র উত্তর তার—আমার বয়স বিশবছর। এই বিশবছর জীবনের মধ্যে আমি ষ্টিফানেতের ন্যায় প্রফুল্লতার প্রতিমূর্ত্তি আমি কখনও দেখিনি।

সেদিন ছিল রবিবার। পক্ষ কালের উপবাসী মন পূর্ণ আশা নিয়ে পথের দিকে চেয়েছিল। কিন্তু গাড়ী যে আর কিছুতেই আসছেনা, মন আমার ক্রমেই উন্মনা হয়ে উঠছিল। সমস্ত সকাল বেলাটা আমার এমনি করেই কাটল কিন্তু কেউ এলনা। তখন মনে করলুম হয়ত মন্দিরের প্রার্থনার পরেই আসবে। কিন্তু দুপুরবেলা ঝড় আরম্ভ হল। সঙ্গে বৃষ্টি। দেখতে দেখতে পাহাড়ের রাস্তা এমন হ'ল যে সে পথে অশ্বচলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ল। তবুও দৃষ্টি আমার পথের দিকেই ছিল। অন্তরের একান্ত কামনা আমার প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় উপেক্ষা করে এখনি হয়ত গাড়ী ছুটে আসবে। আমারই সৌভাগ্যক্রমে কিনা জানিনা, প্রায় তিনটার সময়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, পশ্চিমাকাশে সূর্য্যদেব দেখা দিলেন, নবস্নাত পাহাড় নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। গাছের ঝরঝরানির সঙ্গে পার্ব্বত্য স্রোত-স্বিণীর কল্লোলগীতি আমার জন্য এক অভিনব প্রতিবেশ সৃষ্টি করেছিল। অন্যমনা হয়ে কি ভাবছিলাম, হয়তবা এই সমস্তই দেখছিলাম

এমন সময়ে গাড়ীর শব্দ আমার মনে এক অজানা আনন্দের সুর বয়ে নিয়ে এল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গাড়ী এসে আমার সামনে দাঁড়াল। কিন্তু একি! দেখে আমি আনন্দে বিস্ময়ে নির্ব্বাক নিস্পন্দ প্রায় হয়ে পড়লাম। গাড়ীর চালক আজ আর মিয়ারো নয়, নোরেদমাসীকেও আজ আর দেখছি না, গাড়ীর উপর স্বয়ং ষ্টিফানেত। চোখকে হঠাৎ বিশ্বাস হলনা, ষ্টিফানেত বসে, তার চারদিকে ঝুড়িগুলি সাজানো। পাহাড়ের সোনালী প্রতিবেশ যেন আজ আমার চোখে সমস্ত কিছুকেই সোনালী করে তুলেছে।

ষ্টিফানেত জানালে,—মিয়ারো পীড়িত, নোরেদমাসী ছেলেদের বাড়ীতে গেছে। তাই তাকেই আসতে হয়েছে। পৌছুতে তার দেরী হয়ে গেছে, রাস্তা জানেনা বলে পথ হারিয়েছিল। রবিবারের সাজ গোজ, মাথার ফুল, চুলের ফিতা, পরণের সজ্জা এবং সকলের উপর তার গর্ব্বিত মুখশ্রী আমার কাছে যেন এক মোহময় প্রতিবেশ গড়ে তুলেছিল। নির্জ্জন অরণ্যে তার পথ হারানোর কাহিনী প্রায় আমার কানেই এলনা। এত নিকটে আর কখনো তাকে আমি দেখিনি। শীতকালে ভেড়ার পাল নীচে চলে যেত, আমার সন্ধ্যার আহারের ব্যবস্থা হত গোলাবাড়ীতে। তখন দেখেছি এই ষ্টিফানেতকে, সজীবতার প্রতিমূর্ত্তি, কারও সঙ্গে কথাটী নেই, অথচ দেহে তার প্রফুল্লতা ধরছে না। আজ আমার সাম্‌নে সেই ষ্টিফানেত নির্জ্জন পাহাড়ের উপর, শুধু সেই আর আমি। আমি ক্ষণকালের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম কিনা জানিনা।

গাড়ী থেকে ঝুড়ি নামিয়ে নিজেই সে একটী করে জিনিস গুছিয়ে রাখতে লাগল। উৎসুক নেত্রে সে একবার আমার দিকে

একবার ঘরের আসবাবপত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। তাকে একাজে সাহায্য করা বা তার পানাহারের কোন বন্দোবস্ত করা আমার সাধ্যাতীত ছিল। এর পরে গায়ের ভিজা জামাটা খুলে গাড়ীতে রেখে সে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল। যেখানে আমি ঘুমাই, খড়ের গাদার উপর আমার ভেড়ার চামড়ার বিছানা পাতা, দেয়ালের গায়ে ঝুলান আমার কোট, আমার বন্দুক—সকলই সে একবার করে দেখে নিল। এই সকল দেখে সে কি ভাবছিল আমি জানিনা।

তাহ'লে তুমি এখানেই থাক? আচ্ছা, একা একা তুমি কি ক'রে থাক, ব'সে ব'সে তুমি কি কর? রাত-দিন কি ভাব?

আমার উত্তর করতে ইচ্ছা হল,—বলতে ইচ্ছা হল—"তোমাকেই।" একথা বলা আমার পক্ষে মিথ্যা হতনা কিন্তু উত্তর দিবার শক্তিই আমার ছিল না, আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না। আমার মনে হ'ল সে আমার এই ভাব খুবই বুঝতে পারছিল, তাই আমার বিব্রত ভাবকে আর একটু বাড়িয়ে দেবার জন্যই যেন বল্‌লে— এস্তেরেল কি এখানে আসেনা? তোমার প্রিয় অপ্সরী কি একবারও তোমাকে দেখে যায় না?

এই বলে সে এমনি ভাব করলে যেন সে নিজেই এস্তেরেল পরী। তার মুগ্ধ হাসিতে চারদিক ভরে গেল, ঘাড় ফিরিয়ে অতি দ্রুত সে চলে গেল। আমি যেমন ছিলাম তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল সমস্ত দৃশ্যটা যেন স্বপ্ন।

বিদায়। নমস্কার।

শূন্য ঝুড়িগুলি তুলে নিয়ে সে চলেগেল। পাহাড়ের ঢালু পথে সে নেমে যেতে লাগল। মনে হচ্ছিল গাড়ীর ঘোড়ার পায়ের আঘাত

কঠিন পাহাড়ের বুকেও যেন বাজছিল। বহুক্ষণ ধরে গাড়ীর শব্দ শুনা গেল না, কিন্তু আমার উঠবার ইচ্ছা হ'লনা। ক্রমে দিন শেষ হ'য়ে এল, আমি তন্দ্রাজড়িত ছিলাম, নড়বার সাহস হ'লনা, পাছে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। উপত্যকার সর্ব্বাঙ্গ নীলাভ হ'য়ে উঠল। আবাসে ঢুকবার জন্য মেষের পরস্পর ধস্তাধস্তি যেন পাহাড়ের সান্ধ্যপ্রতিবেশকে কিছুক্ষণের জন্য শব্দময় করে তুলল। এমনি সময়ে শুনলাম নীচে আমাকে কে ডাকছে। চেয়ে দেখলাম ধীরে ধীরে এগিয়ে আস্‌ছে ষ্টিফানেত। তার মুখ মলিন, সর্ব্বাঙ্গ ভিজা, ভয়ে এবং শীতে সে কাঁপছিল। আমি বুঝলাম সরগি নদীর পার থেকেই সে ফিরে আস্‌চে। আজ এই ঝড়বৃষ্টির দিনে নদীতে নিশ্চয়ই বান ডেকেছে। পার হওয়ার চেষ্টা বৃথা—ডুবে যাবার ভয় আছে। এই রাত্রে ষ্টিফানেতের ফিরে যাবার কোন আশা নাই। বাঁকা রাস্তায় একটা পথ আছে বটে কিন্তু ষ্টিফানেত সে পথ জানেনা আর এই নিরীহ জন্তুগুলিকে ছেড়ে আমার পক্ষে ও যাওয়া সম্ভব নয়।

সমস্ত রাত্রি পাহাড়ের উপর এই অজানা নীরব নিস্তব্ধ স্থানে কাটিয়ে দিবার ভয় তাকে সন্ত্রস্ত করে তুলছিল। আমি যথাসাধ্য তাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করলাম। তাকে বললাম—জুলাই মাসের রাত বেশী বড় নয়, দেখতে দেখতেই শেষ হ'য়ে যাবে। ভোরেই সে বাড়ী ফিরতে পারবে।

নদী পার চেষ্টা করে কাপড় চোপড় সে ভিজিয়ে ফেলেছিল। কাপড়গুলি ও হাত পা, কতকটা শুকিয়ে নেবার জন্য আমি আগুন জেলে দিলাম। দুগ্ধ ও কতকটা ছানা তাকে খাবার জন্য

দিলাম। কিন্তু কোন কিছুতেই তার মন ছিলনা। দুই চোখ বয়ে তার কেবলি অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। আমি কি করব ভেবে পাইনি, ভয় হচ্ছিল সমস্ত রাত্রিই হয়ত তার এমনি কেঁদে কেঁদে কাটবে।

দেখতে দেখতে যথার্থই রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল। পর্ব্বত শীর্ষে সূর্য্যকিরণের শেষ রেখা অনেকক্ষণ হল বিলীন হয়ে গেছে, পাহাড়ের গায়ে শায়িত সূর্য্যের শেষ উজ্জ্বলতাটুকু পর্য্যন্ত কখন মুছে গেছে। আমার মনে হল ষ্টিফানেতের ঘুমোবার একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। শুয়ে পড়লে দুঃখ ভার হয়ত তার কতকটা প্রশমিত হতে পারে।

খড়ের উপর নূতন একটা চামড়া বিছিয়ে দিলাম। পাহাড়ের উপর এর বেশী বিছানার বালাই নাই। তবুও রাত্রে যাতে তার সুনিদ্রা হ'তে পারে তার সব রকম বন্দোবস্ত করে আমি নিজের জন্য দরজার কাছেই একটু স্থান করে নিলাম। সমস্ত ঠিক কর্‌তে কর্‌তে আমি মনে মনে একটু গর্ব্ব অনুভব করেছিলাম। এতদিন ধরে নিরীহ মেষ পালের প্রাণ রক্ষা করে এসেছি। কিন্তু আজ আমি এক অমূল্য রত্ন রক্ষার ভার পেয়েছি। এর চেয়ে দায়িত্বের কাজ জীবনে আমি কোনদিন পেয়েছি কিনা মনে নেই, তবে মাথার উপর আকাশ আর কোনদিন এত স্বচ্ছ এত উজ্জ্বল মনে হয় নাই।

শুয়ে শুয়ে আমি এই কথাই ভাবছিলাম, এমনি সময়ে দেয়ালের গায়ে দরজাটা একটু স'রে গেল, ধীরে ধীরে ষ্টিফানেত বেরিয়ে এল। বাইরে মেষের পাল কিসের আনন্দে জানিনা চীৎকার কর্‌ছিল। ষ্টিফানেত এসে আগুনের কাছে বস্‌ল। গায়ে তার ভেড়ার চামড়াটা জড়িয়ে আসেনি, পিঠের দিকে ঠাণ্ডা লাগছে দেখে আমার নিজের চামড়াটা তার পিঠের উপর ফেলে দিয়ে আমি আগুনটা আর একটু ভাল করে জোর ক'রে দিলাম। অনেকক্ষণ ধরেই দুজনে পাশাপাশি

আগুনের কাছে ব'সেছিলাম, কারোর মুখেই কোন কথা নেই। যদি উন্মুক্ত তারকা খচিত আকাশের নীচে কেউ কখনো রাত জেগে থাকে, সে দেখেচে আমরা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকি আর একটা বিচিত্র রহস্যময় জগৎ তখন নির্জ্জন নীরবতার মধ্যেই জেগে থাকে। ঝরণার গানগুলি, সুস্পষ্ট মধুরতর হ'য়ে উঠে, স্রোতস্বিনীর বুকে নক্ষত্রগুলি জ্বলজ্বল করতে থাকে।, পর্ব্বতের উপরে অশরীরী জীবের দল অবারিত যাওয়া আসা করে। মনে হয় সেই নিস্তব্ধতার ভিতরে, সেই অনুভূতিহীন মৃদুধ্বনির মধ্যেই বৃক্ষশাখা বেড়ে উঠে, ঘাসের কুঁড়ি জন্ম নেয়। দিনের আলো চেতনের জীবন, আর রাত্রির অন্ধকারে জড় জগৎ সজীব হয়ে উঠে; প্রাণী জগৎএর সঙ্গে পরিচিত নয় ব'লেই তারা এতে ভয় পায়। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে বসে থেকে থেকে ষ্টিফানেতও ভয় পেয়েছিল, আমার একেবারে পাশে এসে একান্ত নীরব ভাবেই বসেছিল। এক সময়ে নীচে স্রোতস্বিনীর বুকে একটা দীর্ঘ করুণ আর্ত্তনাদ উঠে, চারদিক মুখর করে আমাদের দিকেই তরঙ্গিত হ'য়ে এল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই, আমাদেরই মাথার উপরে একটা নক্ষত্র গতিভ্রষ্ট হয়ে সেই আর্ত্তনাদকেই যেন লক্ষ্য ক'রে ছুটে এসে আলো বিস্তার করে যেন প্রকৃতির গায়েই বিলীন হ'য়ে গেল। ষ্টিফানেত ভীত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, —ও কি ?

"কোন আত্মা স্বর্গে যাচ্ছে।" আমি যিশুকে স্মরণ করলাম। আমাকে দেখে ষ্টিফানেতও তার দুই হাত ক্রুশের মত ধরে অভিবাদন জানালে। কিছুক্ষণ সে শান্ত হয়ে ব'সে রইল, তার পরে হঠাৎ কি ভেবে আমাকে জিজ্ঞেস করলে—"আচ্ছা, তুমি কি যাদু জান? এ কথা কি ক'রে জানলে ?

"না ষ্টিফানেত। একথা তোমার মনে হ'ল কি ক'রে? তবে আমরা নক্ষত্র লোকের কাছে থাকি নীচের লোকের জীবন এখান থেকে ভাল দেখতে পাই।"

ষ্টিফানেত সব সময়েই উপরের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার চারদিকে ভেড়ার চামড়া জড়ান, হাতের উপর ছিল মাথার সমস্ত ভার। উন্মুক্ত আকাশের নীচে তাকে এই ভাবে দেখে মন আমার এক স্বর্গীয় আনন্দে ভরে উঠছিল।

হঠাৎ একসময়ে সে ব'লে উঠল—

"এসব কি? আহা কেমন সুন্দর! তুমি এদের চেন—নাম জানো?"

"জানি। দেখ, ঐ যে আমাদের ঠিক মাথার উপর ছায়াপথ, ওর নাম সেণ্ট জ্যাকের পথ। ফ্রান্স থেকে আরম্ভ ক'রে এপথ স্পেন পর্য্যন্ত গিয়েছে! চার্ল'স যখন সারাসেনদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল, গ্যালিসবাসী সেণ্ট জ্যাক তখন চার্ল'সকে এই পথ দেখিয়েছিল। তার একটু দূরে ঐ যে দেখছ ও আত্মার রথ। ওর আর এক নাম উর্ষ ম্যাজর। রথের নীচের দিকে ঐ দেখ চারটি চাকা কেমন জ্বল জ্বল করছে। এর সামনের তিনটী তারা তিনটী মেষ, আর তৃতীয় নক্ষত্রটীর বিপরীত দিকে ঐ যে ছোট তারাটী দেখছ ও হ'ল রথের সারথি। কোন তারাকে কখনো কি মাটির দিকে নেমে আসতে দেখেছ? ওরা হ'ল সেই সব আত্মা, ভগবান যাদের স্বর্গে আর স্থান দিতে চান না। আরও দূরে ঐ যে দেখচ ওরা হল তিন রাজা। ওরা আমাদের ঘড়ির কাজ করে। ওদের দিকে তাকিয়েই এখন বুঝতে পারছি মধ্য রাত্রি পার হয়ে গেছে। তার নীচে যে তারাটী তাকে দিনের মধ্য ভাগেও দেখা যায়। ওর নাম মিলানের জন! মেষ পালকরা এই মিলানের জন সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প ব'লে

থাকে। মিলানের জন, তিন রাজা, সাত কন্যা এক সময়ে এক নক্ষত্র বন্ধুর বিয়েতে নিমন্ত্রিত হ'য়েছিল। সাত কন্যারা সব সময়ে খুবই ব্যস্ত, সাজ গোজ ক'রে তারা সকলের আগেই রওনা হ'ল তাই এরা এবার উপরে। তিন রাজা পরে রওনা হ'লেও পথে সাত কন্যাকে ধরে ফেললে, কিন্তু মিলানের জন ছিল খুবই আল্‌সে। সে আগে খুব খানিকটা ঘুমিয়ে নিলে। কাজেই সবার পিছনে প'ড়ে রইল। সামনের সবাইকে ধরবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না। তাই শেষে রাগ করে হাতের লাঠিখানা ছুড়ে মারলে। ঐ যে অই তিন রাজার কাছেই মিলানের জনের লাঠি। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর যে তারাটী অই দেখছ সেটী আমাদের তারা, ওর নাম মেষ পালকের তারা। উষার সময়ে যখন মেষপাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি তখন ও আমাদের পথ দেখায়, আবার সন্ধ্যাবেলা যখন ঘরে ফিরে আসি তখনও ও আমাদের আলো দেয়। আমরা একে সুন্দরী ম্যাগিলন নাম দিয়েছি। পিটার-এর পিছনে পিছনে এ চলে। সাত বছরের সময় এদের দুজনের বিয়ে হয়েছে।

"তারারও তবে বিয়ে হয়!"

"কেন হবে না?"

যখন আমি বর্ণনা ক'রে যাচ্ছিলাম এ বিয়ে কেমন, চেষ্টা করছিলাম তাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিতে, আমার মনে হ'ল যেন এক স্বর্গীয় ভাব ক্রমেই কাঁধের উপর নেমে আসছে। ষ্টিফানেতের দুই চক্ষু ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে আস্‌ছিল, মাথাটা তার পরম নির্ভয়ে যেন আমাকেই আশ্রয় করে নিল। রাত্রির আকাশে নক্ষত্র রাজি মলিন হ'য়ে এল, ক্রমে পূবাকাশে দিনের আলো ফুটে উঠল। এই দীর্ঘ সময় ধরে এই অমূল্য ভারকে আমি অতি সন্তর্পনে রক্ষা করেছি, অন্তরে আমার

এক দারুণ ঝড় চলছিল কিন্তু জ্যোৎস্না পুলকিত রজনীর স্বচ্ছ আলো আমাকে পথ দেখিয়েছে। চারদিকে নক্ষত্রদলের নীরব যাত্রা ঠিক মতই চলছিল। মেষ পালের মতই তারা শান্ত। এক এক সময়ে আমার মনে হচ্ছিল ঐ নক্ষত্র রাজির মধ্য হ'তে ওদেরই একটি সবচেয়ে সুন্দরী, সবচেয়ে উজ্জল আজ পথ হারিয়ে পরম নির্ভয়ে এসে আমার স্কন্ধকেই আশ্রয় বেছে নিয়েছে।

শেষ বাতাসের মিল

নাম তার ফ্রান্সিস মামি, বাঁশী বাজিয়েই তার জীবন কাটে। এক এক দিন সন্ধ্যাবেলা সে আমার এখানে আসে; টেবিলের কাছে বসে মদ খায় আর গল্প করে।

সেদিনের এক সন্ধ্যার কথা বলছি; ফ্রান্সিস একটা গল্প বলছিল, গ্রামবাসীদের পুরাতন ইতিহাস। মামির গল্প আমাকে স্পর্শ করেছিল, তাই যেমন শুনেছি ঠিক তেমনি তোমাদের কাছে বলছি।

এই গল্প শোনার আগে মনে কর সন্ধ্যায় এক টেবিলের পাশে তোমরা বসে আছ, আর এক বৃদ্ধ বীণাবাদক তোমাদের কাছে এই গল্প বলছে।

—শুনছেন মশাই, আমাদের এই গ্রাম আজ দেখছেন, চিরকালই আর এমন নিরানন্দ, নির্জীব, মরার মত ছিল না। কত মিলার এখানে বাস করত, দিনরাত চলত মিলের কাজ। চারদিকে দশ-পনর মাইল ধরে কেবল মিল আর মিল। গ্রামবাসীরা তাদের আপন আপন শস্য বয়ে নিয়ে আসত মিলে পিষতে। সমস্ত গ্রামভরা ছিল এই মিল, এগুলি বাতাসে চলত। ডা'ন বাঁয়ে যেদিকে তাকাবে দেখবে পাইন গাছের মাথার উপরে মিলের পাখা চলছে উত্তর-পশ্চিমের বাতাসে—গাধাগুলি রাস্তা দিয়ে বস্তা ব'য়ে আনছে, কখন উঠছে, কখন নামছে।

সপ্তাহ ধরে পাহাড়ের উপরে চলত মিলের কাজ, তাদের জীবনের সাড়া নীচে আমাদের স্পর্শ করত, মন আমাদের ভরে উঠত এক

অপূর্ব্ব আনন্দে। রবিবারে আমরা যেতাম দলে দলে মিলের কাজ দেখতে। মিলারেরা কি আনন্দিত হ'ত আমাদের দেখে! মস্কট শরাব তৈরি করে আমাদের তারা খেতে দিত। মিলার-পত্নীদের কথা শুনবে—তারা থাকত রাণীর মত, কেমন সাজসজ্জা, কত গহনা —সোণারূপার তাদের অভাব ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলত ফারান্দোল নাচ। আজ সেদিন আর নেই, কত বাঁশী আমি বাজিয়েছি সে সব নাচে। যাই বল, এই মিলগুলিই ছিল গ্রামের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত আনন্দের মূল।

তার পরে দুর্ভাগ্য এক দিন আরম্ভ হ'ল; তারাস্কোর পথের ধারে নূতন কল বসল। বাষ্পীয় কল, একেবারে নূতন, দেখতে সুন্দর। দেশের লোক সব শস্য তাদের ওই কলেই নিয়ে যেতে লাগল। বাতাসের কল আর কাজ পায় না। কত দিন তারা বৃথা সংগ্রাম করল, কিন্তু ক্রমেই জীবনীশক্তি তাদের ক্ষীণ হ'য়ে এল। বাষ্পের নিশ্বাসে শক্তি বেশী, তাই বাতাসের কল একটির পর একটি বন্ধ হ'তে লাগল। মিলের গাধাগুলি আর এ পথে চলে না, মিলারপত্নীরা তাদের সোণা গয়না বিক্রয় করে ফেললে। সেদিন থেকে কোথায় গেল মস্কট-রস, কোথায় গেল ফারান্দোল। উত্তর-পশ্চিমের বাতাস আসে কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে যায়, কলের পাখাগুলি নড়ে না। তার পরে এক দিন সবাই মিলে ফেলে দিলে তাদের ঠেলে, তাদের যায়গায় দেখা দিল দ্রাক্ষালতা আর অলিভ গাছ।

এই বিরাট সর্ব্বনাশের মধ্যে একটি মিল কি জানি কেন শেষচিহ্ন স্বরূপ দাঁড়িয়ে রইল—যেন সে এই বাষ্পীয় কলের দম্ভের প্রতিবাদ। মিলটির মালিক মাষ্টার কর্ণি। এক দিন ছিল সন্ধ্যেটা আমাদের যখন তার ওখানেই কাটত।

মাষ্টার কর্ণি বৃদ্ধ। বয়স তার ষাট বছরের উপর। যে আশায় যে উদ্যমে এই সুদীর্ঘ জীবন তার গড়ে উঠেছিল, আজ শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাকে ভেঙ্গে পড়তে দেখে বৃদ্ধ সইতে পারলে না। বাষ্পীয় কলের সৌভাগ্য দেখে নয়, নিজের কলের দুর্ভাগ্য তাকে পাগল ক'রে তুলল। আট দিন ধরে সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সে ছুটে বেড়ালে, ডেকে ডেকে সবাইকে বললে নূতন কলের আটা কেমন ক'রে তাদের এই পবিত্র অঞ্চলকে অপবিত্র করছে—বলছি তোমাদের, "ওখানে যেওনা, যেওনা ওখানে। অই যে দেখছ নূতন কল, ও দানব, ও রাক্ষস! ওকে চালায় কে? —শয়তান। আর এই যে আমাদের কল দেখছ—এ চলে দেবতার নিশ্বাসে।" পুরাতন মিলের জন্য কেঁদে কেঁদে সবারই দ্বারে দ্বারে সে ঘুরে বেড়াল কিন্তু একটি লোকও তার কথা শুনল না, কেউ তার দিকে ফিরে তাকাল না। সবাই ভাবলে লোকটা পাগল হয়ে গেছে।

রাগে দুঃখে বৃদ্ধ মিলের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দ্বার বন্ধ করলে। কাল কাটতে লাগল তার উন্মাদ ক্ষ্যাপার মতই। স্নেহের নাতনী ভিভেতকে সে খুবই ভালবাসত—বৃদ্ধের জীবনে এই বালিকাই একমাত্র অবলম্বন। বালিকার বয়স পনর বছর, পিতামাতার মৃত্যুর পরে কর্ণিয়ের আদরযত্নেই সে আজ এত বড় হয়েছে। সবাই জানত বালিকার সমস্ত চাওয়া সমস্ত পাওয়াকে প্রাণ দিয়ে ভরে দেওয়াই বৃদ্ধের একমাত্র আনন্দ। কিন্তু মিলের দ্বার আজ তার পক্ষেও রুদ্ধ—নিজের অন্নবস্ত্র আজ তাকে নিজেকেই সংগ্রহ করতে হয়। রেশমের সূতা কেটে প্রতিবেশীর দ্বারে দ্বারে তা নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়—কেউ কিনে নিলে তাই দিয়ে তার জীবন চলে; কিন্তু বৃদ্ধ তাকে আজ যে একেবারে ভুলে গেছে তাও নয়। দুপুরের প্রখর রোদের মধ্যে তিন মাইল হেটে

মাঝে মাঝে সে তাকে দেখতে আসে। কিন্তু ভিতেত কাছে এলেই বৃদ্ধ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকে, তার দুই চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় জল গড়িয়ে পড়ে।

গ্রামের মধ্যে সবাই জানে এই বুড়ো বয়সে কর্ণি টাকার প্রলোভনে পড়েছে, সেই জন্যই দিনরাত এমনি করে মিলের মধ্যে বন্ধ হয়ে এতটুকু বালিকাকে ছেড়ে থাকে। নিরীহ বালিকা এমনি ক'রে পরের দোরে দাসত্ব করবে এ কেউ সইতে পারত না। বৃদ্ধকে দেখেও সবার দয়া হ'ত। তারা বলত "মাষ্টার কর্ণি এক সময়ে আমাদের কি শ্রদ্ধার পাত্রই না ছিল। এ অঞ্চলে সবাই তাকে চেনে, এমনি করে খালি পায়ে ছেঁড়া কাপড়ে সে রাস্তায় বেরোবে একথা আমরা কোন দিন ভাবিও নি।" প্রার্থনা-মন্দিরে তাকে দেখতাম; আমাদের ঘৃণা হ'ত দেখে। একদিন আমরাই ছিলাম তার বন্ধু, কিন্তু এখন তাকে দেখলেই দূরে সরে যেতাম সবাই। মাষ্টার নিজেও বোধ হয় একথা জানত, তাই গির্জ্জায় সে দরিদ্র শ্রমিকদের পাশেই গিয়ে বসত।

কিন্তু বৃদ্ধ কর্ণির জীবনে কতকগুলি ব্যাপার ছিল যা কারও কাছেই খুব স্পষ্ট ছিল না। এক কণা শস্য তাকে মিলের মধ্যে কেউ কখন নিয়ে যেতে দেখে নি কিন্তু দেখা যেত মিলের পাখা তার আগের মতই ঠিক চলছে। সন্ধ্যেবেলা আটাভরা বস্তাগুলি গাধার পিঠে চাপিয়ে রাস্তা দিয়ে শহরের দিকে যেতে প্রতিদিনই তাকে সবাই দেখত।

—নমস্কার, মাষ্টার কর্ণি, মিল তোমার তা হ'লে বেশ চলছে।

বৃদ্ধ মিলার পরম উৎসাহে উত্তর করত, হাঁ, ভালই চলছে তোমাদের আশীর্ব্বাদে। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার কখন কাজের অভাব হয় না।

এর পরেও হয়ত কেউ কখন জিজ্ঞাসা করত,—কোন শয়তান তাকে এত কাজ দেয়, আর দিনরাত এত আটা তৈরী হয়ে যায়ই বা কোথায়

কিন্তু সে মুখে আঙুল দিয়ে বলত—“চুপ, ও কথা জিজ্ঞাসা ক’রো না—আটা তৈরি ক’রে আমি বাইরে পাঠিয়ে দিই।” এর বেশী কেউ কোন দিন তার কাছ থেকে বার করতে পারেনি।

মিলের সামনে দিয়ে চলে যেতে সবাই দেখত দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, মিলের পাখা চলছে সব সময়েই, এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিরাম নেই। দেখত—গাধাগুলি সামনে ময়দানে আপন মনে চরছে, একটা প্রকাণ্ড বড় বিড়াল জানালার কাছে রোদে বসে ঘুমুচ্ছে।

আসে পাশের লোকের কাছে এসব খুবই রহস্যময় ছিল। এ নিয়ে তারা আলোচনাও খুবই করত। নিজ নিজ কল্পনা দিয়েই সবাইএর সমাধান করত কিন্তু সাধারণ জনরব ছিল এই যে মিলের মধ্যে আটার বস্তা যত আছে, তার চেয়েও বেশী আছে টাকার বস্তা।

শেষে একদিন কিন্তু সকল রহস্যই প্রকাশ হয়ে পড়ল কেমন ক’রে তা বলছি ঃ—

সমস্ত জীবন আমি বাঁশী বাজিয়েই কাটিয়েছি। বছরের সমস্ত দিনগুলিই ছিল আমার কাছে একই রকম। এ আমার আনন্দ কি নিরানন্দ তা কখনও ভেবে দেখি নি, কিন্তু এক দিন সত্যি সত্যিই বুঝলাম আনন্দ কি। এক দিন শুনলাম আমার বড়ছেলে আর ভিভেত্ পরস্পরকে ভালবেসেছে। মনে মনে এতে আমি একটুও রাগ করি নি। যাই হোক, মাষ্টার কর্ণি এক সময়ে সবার শ্রদ্ধার পাত্রই ছিল। আর ভিভেত্, ওকেও আমি ভালই বাসতাম। আমারই ঘরে আমারই সামনে সব সময়ে ও চলবে, চড়ুই পাখীর মত লাফিয়ে বেড়াবে, উড়বে আমার সুমুখদিয়ে, আমি ওকে আদর করব, আহা কত দুঃখই না বালিকা পাচ্ছে। চিন্তা ক’রে মনে মনে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। পাছে আবার কোন আঘাত ঘটে এই ভয়ে মনে

করলাম বিয়েটা তাড়াতাড়িই সম্পন্ন হয়ে যাক। মনের উৎসাহে তাড়াতাড়ি চলে গেলাম বন্ধ মিলে, বৃদ্ধ মিলারের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু কি আমার অদৃষ্ট কি সম্ভাষণই বৃদ্ধ আমাকে জানালে, তা যদি দেখতে! আমার সহস্র অনুরোধেও একবার সে দার খুলল না, দরজার ফাঁক দিয়ে আমি বললাম আমার আসার কারণ কিন্তু বৃদ্ধ যেমন ব'সে ছিল ঠিক তেমনি বসেই রইল। মাথার উপর তাকিয়ে দেখলাম কাল বিড়ালটা শয়তানের ক্রুর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে।

বৃদ্ধ আমাকে কোন কথাই বলতে দিলে না। স্পষ্ট জবাব দিলে, পরিষ্কার ভাষায় বললে—"তোমার কোন কথাই আমি শুনতে চাই না, এর চেয়ে বাড়ী গিয়ে বাঁশী বাজাও। আর ছেলের বিয়ে যদি দিতেই হয় ত নতুন মিলে যাও না। সেখানে গিয়েই মেয়ে খোঁজ গে, এখানে কেন?"

বুঝতেই পার তার মুখে এ সব শুনে কি আমার মনে হয়েছিল আমার মাথায় কেমন খুন চড়ে গিয়াছিল। কিন্তু তবুও এক দিন ত তাকে শ্রদ্ধাই করতাম। ফিরে এসে ওদের দুজনের কাজে সব কথাই আমি বললাম। কিন্তু ওরা কিছুতেই আমারকথা শুনবে না, শেষে আমাকে জানালে দুজনে এক সঙ্গে মিলে গিয়ে বৃদ্ধের কাছে অনুমতি চেয়ে আনবে! তাদের এ প্রার্থনা মঞ্জুর না করার মত সাহস আর যারই হোক অন্ততঃ আমার ছিল না। ওরা দুজন তৎক্ষণাৎ রওন হ'ল।

দুজনে এক সঙ্গে যখন মিলে গিয়ে পৌছল, বৃদ্ধ তখন বাইরে গেছে। মিলের দ্বার বাইরে থেকে বন্ধ কিন্তু মিলের মইখানা বৃদ্ধ ভুল ক'রে যাবার সময়ে বাইরেই রেখে গেছে। ওদের মাথায় কি খেয়াল চাপল, জানালার পথে ওরা মিলে ঢুকবে, মিলের মধ্যে কি আছে ওরা দেখবে।

আশ্চর্য্য ব্যাপার ! মিলের মধ্যে সমস্ত কক্ষই শূন্য। একটা বস্তা নেই, এক কণা শস্য নাই সেখানে। একটুও আটা নাই এমন কি চলতি মিলের গন্ধ পর্য্যন্ত নেই ! মিলের সমস্ত ভিতরটা ধুলায় আচ্ছন্ন। কোনকালে এ যে চলেছে, তার চিহ্নও নেই।

ধীরে ধীরে দুজনে তারা নীচে নামল কিন্তু সেখানকার আরও দুরবস্থা। একটা ময়লা বিছানা কত কালের পুরাতন, কতগুলি ছেঁড়া নেকড়া, এক টুকড়া রুটী, আর এক কোণে তিনটে বা চারটে বস্তা পাথরের নুড়ি এবং মাটি ভরা। এই সেখানকার সমস্ত জিনিস।

এই হ'ল কর্ণির মিলের সমস্ত রহস্য। মিলের সম্মান তাকে রক্ষা করতেই হবে তাই সন্ধ্যেবেলা, নুড়িভরা, মাটি ভরা বস্তা নিয়ে সে রাস্তায় বেড়োত, লোকে জানত মিল চলছে ; হতভাগ্য মিল হতভাগ্য কর্ণি ! নূতন মিল অনেক আগেই এর জীবন কেড়ে নিয়েছে। মিলের পাখা আজও চলছে কিন্তু এর অন্তরের বিরাট শূন্যতা পূর্ণ করবার এক বিন্দু কিছু এখানে অবশিষ্ট নাই।

মিল থেকে দুজনে ওরা ফিরে এল কিন্তু চোখে ওদের জল। সব এসে ওরা আমাকে বললে, সবই শুনলাম আমি মন দিয়ে। এক মুহূর্ত্ত দেরী না ক'রে তখনই উঠে পড়লাম, প্রতিবেশীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে সংক্ষেপে সবই তাদের খুলে বললাম। স্থির হ'ল যার বাড়ীতে যতটুকু শস্য আছে তাই নিয়ে এখনই আমরা কর্ণির মিলে যাব সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ হ'ল। সমস্ত গ্রামবাসী রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম, দল বেঁধে গাধার পিঠে শস্য চাপিয়ে মিলের দরজার গিয়ে দাঁড়ালাম।

মিল খোলা ছিল। দেখলাম দরজার কাছে বৃদ্ধ কর্ণি মাথায় হাত দিয়ে কাঁদছে পায়ের কাছে এক বস্তা পাথরের নুড়ি। ফিরে

এসে বৃদ্ধ বুঝেছে তার অনুপস্থিতিতে এখানে কেউ ঢুকেছিল, মিলের সমস্ত রহস্য আজ সবার জানা হয়ে গেছে। সে বলছিল—এখন আমার মরাই ভাল। আমার মিল আজ অপবিত্র হয়েছে।

কান্নায় তার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল। মিলের কত কি নাম ক'য়ে সে কেঁদে কেঁদে বিলাপ করছিল—যেন সে কোন মানুষ আর কি!

ঠিক এই সময়ে বস্তা বোঝাই গাধাগুলি তার সামনে এসে দাঁড়াল। যথাসাধ্য জোরে সবাই মিলে আমরা চীৎকার করে উঠলাম—"মাষ্টার কর্ণি দীর্ঘজীবী হোক, মিল তার বেঁচে থাক।" সকল বস্তার মুখ খুলে দেওয়া হ'ল শস্য সব মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল।

বৃদ্ধ কর্ণি দুই চোখ মেলে বিস্মিতের মত ফ্যাল এ্যাল করে সকলের দিকে তাকালে। কতকটা শস্য সে তার হাতের মধ্যে নিল, তার পর বলতে লাগল—তার চোখে তখনও জল কিন্তু মুখে হাসি—

"হায় ভগবান, এই ত শস্য! একেবারে সত্যিকার শস্য—এত আদরের আমার! একবার ভাল ক'রে দেখে নিই।

তার পরে আমাদের দিকে ফিরে বলতে লাগল—আমি জানি আমার কাছেই তোমরা ফিরে আসবে। নতুন কলের ওরা সব চোর।

আমরা সমস্ত গ্রামবাসী মহাসমারোহে তাকে গ্রামে ফিরিয়ে নিতে চাইলাম। কিন্তু কোনমতেই সে সম্মত হ'ল না। সবার দিকে চেয়েই সে বলল—মনের আনন্দ সে ধরে রাখতে পারছিল না—

"তোমরা বোঝো না ভাই, আমার মিলকে আগে কিছু খেতে দিয়ে নি তবে ত। একবার ভেবে দেখ দিকি কত কাল ধরে ও এমনি অনাহারে পড়ে আছে, কতকাল ধ'রে ওর পেটে কিছু পড়ে নি।"

বস্তা খুলে শস্যগুলি সে মিলের মধ্যে ঢেলে দিলে সমস্ত আকাশ

ধূলিতে তার আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমরা দেখলাম বৃদ্ধ এদিক ওদিক ফিরছে আর মাঝে মাঝে একদৃষ্টে মিলের দিকে চেয়ে আছে। দেখে চোখ আমাদের অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

আমি জানি জীবনে আমি এই একটা কাজই করেছিলাম। সেদিন থেকে বৃদ্ধ মিলারের আর কাজের অভাব হয় নি।

তার পরে এক দিন প্রভাতে কর্ণি মরে গেল, শেষ মিলটির পাখা বন্ধ হ'ল কিন্তু আর কেউ তার স্থান নিলে না। আপনি কি মনে করেন! মশাই, জগতে সবকিছুরই শেষ আছে। আমারও মনে হয় বাতাসের কলের দিনও চলে গেছে।



দুইটি হোটেল

জুলাই মাসের অপরাহ্ন। আমি নীস থেকে ফিরছি। দুঃসহ গ্রীষ্ম। সমস্ত আকাশ ভরা রূপালী রোদ, নীচে ছোট ছোট জলপাই ও ওক গাছ, তারই মধ্য দিয়ে আমার পথ—ধূলায় আচ্ছন্ন, চলবার উপায় নেই। কোনখানে ছায়ার নামগন্ধ নেই, বাতাসের নিশ্বাসটি পড়ছে না। প্রকৃতির এই অসহ্য রূপের সঙ্গে মিশেছিল ঝিঁঝিঁ পোকার কর্কশ সুর, আমার চারদিকের পৃথিবীটা যেন এক উন্মত্ত সংগীতে পরিণত করেছিল।

প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে এই মরুপথে আমি চলেছিলাম। সম্মুখের ধূলির আবরণ ভেদ করে কয়েকখানা সাদা রঙের বাড়ীর ছায়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এ স্থানকে লোকে সেণ্ট ভিন্সেণ্টের পান্থ-নিবাস বলত। প্রথমে পাঁচ ছয়টা খড়ের গাদা—তাদের লাল রংএর ছাদ তারপরে একটা অশ্বের জলপানের ব্যবস্থা—জল নেই বোধ হয়, এই দারুণ গ্রীষ্মেই শুকিয়ে গেছে এবং পরিশেষে রাস্তার দুইধারে ঠিক মুখোমুখী পরস্পরের দিকে চেয়ে দুই বিরাট হোটেল।

দর্শনমাত্রই এই দুই হোটেল লোকের বিস্ময়োদ্রেক করে। একদিকে প্রসাদতুল্য বাড়ী—যেন জীবনে ভরপুর, সর্বত্র কর্ম্মময়, সমস্ত দরজা জানালা উন্মুক্ত, সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে, অশ্ব হাঁপাচ্ছে—এখনি হয়ত কেউ তার সাজসজ্জা খুলে নিবে। যাত্রির দল সবাই খুব ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি করতে রাস্তার উপর গাছের নীচে দাঁড়িয়েই পানকার্য সেরে নিচ্ছে। সমস্ত প্রাঙ্গণ গাড়ি ঘোড়ায় পূর্ণ, কতগুলি ভাড়ার

অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অভ্যন্তরে কোথাও চিৎকার, কোথাও খেলার শব্দ, কোথাও টেবিলের উপর সশব্দে চাপড়, গ্লাসের ঝনঝন শব্দ। কোথাও বিলিয়ার্ড খেলা চলছে, কোথাও কেউ হয়ত লিমোনেড খুলে পান করছে তার শব্দ। এই সমস্ত শব্দকে ডুবিয়ে দিয়ে গৃহাভ্যন্তর থেকে ভেসে আসছিল এক মোহন সংগীত—এক পরিপূর্ণ আনন্দের সুর। গানের সুরে জানালার শার্শিগুলি পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠেছিল।

সাত সকালে ভোরে উঠে সুন্দরী,
রূপার কলসী হাতে নিয়ে আনতে গেছে জলভরি।

আর সম্মুখের হোটেল, জনমানবের সাড়াশব্দ নেই, মনে হয় একেবারে নির্জন। ভিতরে ঢুকতেই দরজার উপর ঘাসের চাপড়া, কবুতর শ্রেণী তার উপর বসে, পাশেই হলিগাছের ঝোপ, ভিতর পর্যন্ত সমস্ত পথটা নুড়ি দিয়ে ছড়ান। সমস্ত দৃশ্যে এমন একটা দারিদ্র্য, এমন একটা কারুণ্য ছাপিয়ে উঠেছে যে, বিশেষ করুণার বশীভূত না হ'লে সেখানে কেউ প্রবেশ করত না।

তখুও কি যেন মনে করে আমিও সেই বাড়িতেই ঢুকে পড়লাম। সামনে মস্ত বড় হলঘর, কিন্তু নির্জন—যেন শোকাচ্ছন্ন পুরী। পর্দা-বিহীন তিনটি জানালা দিয়ে দিনের আলো ভিতরে প্রবেশ করছে, নিঃশব্দ পুরীকে যেন আরও নির্জন, আরও মুহ্যমান করে তুলেছে। পা ভাঙ্গা কয়েকটি টেবিল, তার উপর পড়ে আছে কয়েকটা গ্লাস—কেউ কোনদিন তার গায়ের ধুলা ঝেড়েছে বলে মনে হয় না। পকেটশূন্য ভাঙ্গা বিলিয়ার্ড টেবিলটা কতকাল যে এখানে ঘুমিয়ে আছে কেউ খবর রাখে না। হলদে রংএর একটা সোফা, বহুকালের পুরাতন একটা ক্যাসিয়ারের টেবিল, নিরানন্দ গৃহের পরিপূর্ণ দারিদ্র্যের পরিচয়

দিচ্ছে। আর মাছি, এমন মাছি জীবনে আমি আর কোথাও দেখিনি ; মেঝেতে, জানালায়, গ্লাসের উপর, কোথাও এতটুকু স্থান বাকি নেই। দরজা ঠেলে আমি ভিতরে প্রবেশ করতেই তারা পাখা কাঁপিয়ে এমনভাবে শব্দ করে উঠল, যেন আমি কোন মৌচাকে ঢুকে পড়েছি।

অভ্যন্তরে দরজা থেকে একটু দূরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে এক রমণী জানালা দিয়ে বাইরের দিকেই মুখ ক'রে ধ্যানমগ্ন—নিবিষ্ট মনে কি যেন দেখছে। আমি দুবার ডাকলাম—আজ্ঞে, শুনছেন!

রমণী ফিরে আমার দিকে তাকাল। আমি দেখলাম, গভীর দারিদ্র্যে আঁকা পল্লী রমণী, সমস্ত অঙ্গে মলিনতার ছায়া, দেহের বর্ণ যেন মাটির রংএর সঙ্গে মিশে গেছে। লাল রংএর একটা জ্যাকেট পরা, আজকাল এদিকে বৃদ্ধারা যেমনি পরে থাকে। কিন্তু দেখে মনে হয় রমণীর বয়স এখনও ত্রিশ পেরোয় নি! অশ্রুই তাকে এমনি মলিন করে তুলেছে।

"আপনি কি চান?" চোখ খুলে রমণী জিজ্ঞেস করলে।

--আপনার এখানে আমি একটু বিশ্রাম করে নেব এবং যা হয় কিছু খাবার···

রমণী যেন কতকটা আশ্চর্য্যন্বিত হয়েই আমার দিকে চাইলে, সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। একটু নড়বার চেষ্টাও করলে না। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

—এটা কি তবে হোটেল নয়?

রমণী দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

—হ্যাঁ, আপনি বলেন তো এটা হোটেল বটে। কিন্তু সবাইর মত আপনিও ঐ সামনের হোটেলে না গিয়ে এখানে এলেন কেন? সেটা তো বেশ ভাল, সবাই পছন্দ করে।

—অত ভাল আমার পছন্দ হয় না ; আমি এক দণ্ড জিরোতে চাই—একটু শান্তিতে, সেই জন্যই এখানে এসেছি। কি জানেন, ওটা আমার পক্ষে একটু বেশী ভাল।

এর পরে আর কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই টেবিলের সামনে একখানা চেয়ার টেনে আমি ব'সে পড়লাম।

এবারে যুবতী নিশ্চিন্ত হ'ল, আমি তার সঙ্গে অন্তত ঠাট্টা করছি না। তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমার টেবিল চেয়ার বেশ ঝেড়েপুছে ঠিক করে দিলে। হঠাৎ তার মধ্যে কোথা থেকে এক কর্মব্যস্ততা এসে পড়ল। এই টেবিল ঝাড়ছে, গ্লাস পরিষ্কার করছে, মুখ খুলে বোতল থেকে লিমোনেড ঢালছে। যেন পথিকের সেবা করাই তার সমস্ত জীবনের একমাত্র কর্ম। কিন্তু এরই মধ্যে কখনও কখনও সে এক একবার থম্‌কে দাঁড়াচ্ছে,—মাথায় হাত দিয়ে কি যেন ভাবছে, মনে হচ্ছে কি যেন তার হারিয়ে গেছে ; সমস্ত কাজের মধ্যেও হতাশ হৃদয়ে কার যেন প্রতীক্ষা করছে।

যুবতী এর পরে ভিতর দিকে চলে গেল। আমি কান পেতে শুনলাম, সে চাবি দিয়ে তালা খুলছে, রুটি নিয়ে ঝেড়ে ঠিক করছে, বাসন ধুয়ে তাতে সেগুলি রাখছে। মধ্যে মধ্যে এক একটা দীর্ঘশ্বাস এক একটা মর্মান্তিক বেদনার অভিব্যক্তি—পুরাতন রঙ্গীন কাপড়ের পরদা ভেদকরেও এদিকে ভেসে আসছিল।

প্রায় পনের মিনিট এইভাবে কেটে যাবার পর সে আমার সামনে এল। একখানি ডিসে কয়েকটুকরা রুটি—কত পুরাতন তার কেউ খোঁজ রাখে না, আর একগ্লাস টক মদ।

—"এই যে নিন।" এই বলে ডিসখানা ও গ্লাসটি আমার আমার সামনে রেখে যেমনি ছিল, ঠিক আগের মতই জানলার কাছে

ফিরে গিয়ে বসল।

খেতে খেতে আমার কথা বলার ইচ্ছা হল।

—এখানে বোধহয় কেউ আসে না।

—না, একজনও না। আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা যখন এখানে একা ছিলাম—সে কথা আলাদা। আমাদেরও গাড়ী ঘোড়া ছিল, আমরা বেড়াতে যেতুম, শিকারে যেতুম। কিন্তু যেদিন থেকে ওরা এখানে এসেছে, আমাদের সুদিন আর নেই। সবাই এখন সামনের বাড়িতেই যায়। এদিকে আর কেউ ফিরেও তাকায় না। কি জানেন, এই বাড়িটা দেখতে খুব ভাল না কি না! আর আমিও দেখতে তেমন সুন্দরী নই। আমার জ্বর হয়েছিল, দু'টি ছেলে আমার মরে গেছে। আর ওখানে দেখুন গিয়ে সবাই কেমন হাসছে। ও হোটেল রাখছে আলে'সিয়েন'। দেখতে সে বেশ সুন্দরী, গলায় তার তিন লহর হার। যার হোটেল সে ওকে খুবই ভালবাসে—বলে ওই তার ভাগ্য। তা ছাড়া আর সব দাসদাসীরাও বেশ ভালই। আর আলে'সিয়েনের রূপ আছে, ধনী লোকের গাড়ি তারই বাড়ির চারদিকে আজও ঘুরে বেড়ায়। আর আমি এখানে নির্জনে নিরানন্দ কক্ষে দিন কাটাচ্ছি—জনমানবের সাড়া শব্দ নেই, আমার হাতে খাবার জন্য এখানে একটি লোকও নেই।

যুবতীর গলার স্বর কম্পিত, কতকটা উদাসীনভাবেই সে সব বলে যাচ্ছিল। শরীর তার ক্রমেই জানালার বাইরের দিকে ঝুকে পড়ছিল। সামনের বাড়িতে কোন কিছু যেন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

হঠাৎ রাস্তার উপরে গাড়িগুলি যেন সজীব হয়ে উঠল। চলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাস্তা যেন ধুলিতে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। ঘোড়ার পিঠে চাবুকের শব্দ শুনা যাচ্ছিল, পরিচারক বালকের দল দ্বারের

কাছে ছুটে আসছিল, বালিকার দল এসে সমস্বরে জানাচ্ছিল—বিদায়! বিদায়!

এই সচল সজীব জগৎকে মুখরিত ক'রে আবার সেই সুর—

ভোরে উঠে জলে গেল কাঁখে রূপার গাগরী।
তিন ডাকাতে দেখলেম পথে ফিরল না আর নাগরী॥

স্বর শুনে যুবতীর সমস্ত দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠল, কম্পিত স্বরে সে আমার দিকে চেয়ে বলতে লাগল—

—আপনি শুনছেন? ওই গান করছেন আমার স্বামী। কেমন বেশ সুন্দর লাগল নয়! বেশ ভাল গান নয়?

আমি একটু অপ্রতিভ হ'য়ে তার দিকে তাকালাম।

—সে কি? আপনার স্বামী? তিনি ওখানে? তিনিও কি…?

যুবতীর দুই চোখ বেদনায় ছল ছল ক'রে উঠল। একটু সামলে নিয়ে সে বললে—কি জানেন? পুরুষ মানুষ অমনিই, কান্না সইতে পারেনা কি না! আর আমি কি জানি কেন ছেলে দুটি মরার পর থেকে না কেঁদে একেবারেই থাকতে পারি না। আর এই নিরানন্দ বাড়ি ও একদম সইতে পারে না। তাই যখন খুব খারাপ লাগে মাঝে মাঝে জোসেফ ওবাড়িতে যায়। ওর গলাটা খুব ভাল, তাই আলে'সিয়েন ওকে গাইতে বলে। তার গান সে খুব পছন্দ করে। চুপ! ঐ শুনুন, আবার গাইছেন।

দুই চোখ তার অশ্রু ভরা। যুবতী কথা বলতে বলতে কাঁপছিল। দুই হাত সামনে রেখে জানালা ধরে সমস্ত দেহ মন দিয়েই সে শুনছিল স্বামী তার আলে'সিয়েনকে সন্তুষ্ট করার জন্যই গাইছিল—

"প্রথম ডাকাত বললে ডেকে, সুন্দরি!"

বোকেয়ারের গাড়ী

সেইদিনই আমি পৌঁছেছি সেখানে। বোকেয়ারের গাড়ী ধরলাম। পুরান গাড়ী—পথ বেশী নয় কিন্তু সমস্ত পথটাই ঝকঝক করে চলছিল গাড়ী। সন্ধ্যার হাওয়ার মধ্যদিয়ে আমরা যখন গন্তব্যস্থানে পৌছলাম তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। গাড়ীচালক ছাড়া গাড়ীর মধ্যে ছিলাম আমরা পাঁচজন।

প্রথমেই ছিল ক্যামার্গ সহরের এক দরোয়ান, বেটে, মোটাসোটা, গায়ে লোম একটু বেশী, দেখে প্রথমটা জানোয়ার বলেই ভুল হওয়াও একেবারে আশ্চর্য্যনয়। বড় বড় চোখ দুটা তার রক্তবর্ণ, দুই কানে তার দুইটা রূপার আংটী। তার পরেই বসেছিল দুইজন বোকেয়ার বাসী, একজন রুটীওয়ালা এবং তার একজন লোক। দুইজনেরই গায়ের রং কটা, দুইজনেই মোটাসোটা, মুখের চেহারায় ছিল কতকটা উদ্ধতভাব, ভিতেলিয়াসের প্রতিমূর্ত্তি নিয়ে দুই মেডেল যেন। সব শেষে বসেছিল আর একজন, ড্রাইভারের একেবারে কাছে। লোক তাকে ঠিক না বললেও চলে, খরগোসের চামরার মস্ত বড় টুপীর নীচে কি ছিল তা বাইরে থেকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারা যাচ্ছিল না। দেখে তাকে খুব বিশেষ কিছু মনে হচ্ছিল না, তবে কিছু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল লোকটাকে।

এরা পরস্পর সবাই সবাইকে চেনে, বেশ সহজভাবে কথা বলছিল এই লোকগুলি। ক্যামার্গবাসী লোকটা বলছিল, নিস থেকে আসছে সে। পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে সেখানে জুরী ডেকেছিল, এক মেষপালককে শাস্তি

দিবার জন্য। তার গল্পশুনে সবার রক্ত গরম হয়ে উঠছিল যেন। আর দুই বোকেয়ারবাসী, তারাই বা নীরব থাকবে কেন ? বোঝাগেল দুই গির্জায় উপাসনা করে তারা দুইজন। রুটিওয়ালা বহুদিন থেকে যে গির্জায় যাওয়াআসা করছে তা ম্যাডোনার নামে উৎসর্গ করা। গ্রামবাসীরা এই ম্যাডোনাকে মেরীমাতা বলে থাকে, ক্ষুদ্র শিশু যীশু তার কোলে। কিন্তু সঙ্গী তার প্রার্থনা করে অন্য এক গির্জায়, নববিধানে উপাসনা হয় সেখানে। যে প্রতিমূর্ত্তি সেখানে আছে হাসি হাসি মুখতার, দুই বাহু দুইদিকে ঝুলে পড়েছে, হাতের তালু থেকে রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। এই নিয়েই ঝগড়া হচ্ছিল তাদের। দেখবার বিষয় দুইজনেই ক্যাথলিক কিন্তু কেমন সন্দেহ তাদের নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরের ম্যাডোনার মধ্যে।

—আচ্ছা, কিসের আনন্দ তোমাদেরঅই মূর্ত্তিটার, অত হাসিটা কিসের ?

—আরে রেখে দাও তোমার মেরীমাতাকে, দেখাগেছে সব!

—আর প্যালেষ্টাইনে কি দিনটাই কেটেছে তোমাদের এই দেবীর!

—আর তোমার অইটী, হুঁ, কি বিশ্রী দেখতে! কে না জানে কি করেছে সে ? না হয় সেণ্ট জোসেফকেই জিজ্ঞাসা করে দেখবে না।

পরস্পরকে আপন আপন ধর্ম্মমত বিশ্বাস করাতে গিয়ে হয়ত শীগগিরই ছোরা ছুরি বেরিয়ে আসছিল প্রায় এবং আমার বিশ্বাস এই পথেই তাদের ধর্ম্মযুদ্ধের মীমাংসা হত কিন্তু বাধা দিল ড্রাইভার।

হাসতে হাসতে বললে সে—আরে রেখে দাওনা তোমাদের এই ম্যাডোনা আর মূর্ত্তির কথা! বলতেগেলে এ দুটোই মেয়ে মানুষ, পুরুষ মানুষের এ নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে চলেনা।

শূন্যে বাতাসে শম শম করে চাবুক ঘুরছিল তার, সে শব্দ ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে।

এর পরে কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়ে গেল তাদের। কিন্তু কিজানি কেন রুটিওয়ালার উত্তেজনা একটু বেড়ে গিয়েছিল। কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারছিলনা সে। হতভাগ্য নীরব ক্লান্ত টুপি একধারে নিজমনে বসেছিল। সেইদিকে চেয়ে বিদ্রূপের স্বরে বললে সে—

—আরে তোমার স্ত্রী—কি খবর তার? এখন তোমার সঙ্গে না সেই লোকটার সঙ্গে। কি বল ছুরিওয়ালা? কোন গির্জায় উপাসনা করে সে?

কণ্ঠস্বরে মনে হল এগুলি তার ভয়ানক রসিকতার কথা। তাছাড়া গাড়ীশুদ্ধ সবাই হেসেউঠল তার কথা শুনে। কিন্তু যাকে উদ্দেশ করে কথাগুলি বলা হ'ল একমাত্র তার মুখেই হাসি দেখা গেলনা। মনে হ'ল এর কোন কথাই শুনবার মত মন নেই তার। দেখে রুটিওয়ালা আমার দিকেই ফিরে বলতে লাগল—

—মশাই, আপনি চেনেননা তাকে—সেই মেয়ে লোকটাকে। এমন হাসির বস্তু এ অঞ্চলে আর নাই—বোকেয়ারে এমন জুটী আপনি দেখতে পাবেন না।

সবাই মিলে হেসে উঠল আবার। ছুরিওয়ালা আর চুপ করে থাকতে পারলেনা। মাথা না তুলেই খুব ধীরে ধীরে বললে সে—

—আঃ! একটু চুপ করোনা তোমরা। কি করছ এ?

কিন্তু সেই লক্ষীছাড়া রুটিওয়ালার কোন লক্ষণই দেখা গেলনা থামবার। বেশ ভালকরে বসে আর একবার আরম্ভ করলে সে—

—কি নচ্ছার মশাই! আর এমন স্ত্রী পেয়েও বন্ধুর আমার কোন অভিযোগ নেই—এক মুহূর্ত্তের জন্য বিরক্তি নেই। ভেবে দেখুন দেখি—দুই মাস ধরে দেখা নেই স্ত্রীর কিন্তু তার পরে ফিরে এসেই কাঁদবে এক গল্প। প্রতিবারেই সেই এককথা, কি নচ্ছার! ভেবে দেখুন, বিয়ের

পর এক বছরও কাটেনি তখন, স্ত্রী চলে গেল স্পেনদেশে এক চকলেট-ওয়ালার সঙ্গে।

গৃহে হতভাগ্য স্বামী রাত দিন কাঁদত আর মদ খেত। ঠিক পাগলের মত হল সে। কিছুদিন পরে স্ত্রী ফিরে এল দেশে, পরণে স্পেনদেশী পোষাক, সঙ্গে একটা ড্রাম। আমরা সবাই বললাম তাকে—

—ফিরে এসেছো, এবারে ও মেরে ফেলবে তোকে, আস্ত রাখবে না আর।

হাঁ ঠিকই বলছি। কিন্তু তাকে মারবে ও! বেশ শান্তিতেই কাল কাটতে লাগল দুজনের। আবার স্ত্রী তাকে ড্রাম বাজিয়ে খেলা করতে শিখালে।

আর এক বার নূতন করে হেসে উঠল সবাই দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে। ছুরিওয়ালা সেই কোণেই মাথানীচু করে বসেছিল। আস্তে আস্তে বিড় বিড় করে বললে—

— আরে! কিবলছ এসব? একটু থামোনা বলছি।

কিন্তু রুটিওয়ালা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বলতে লাগল—

...আপনি হয়ত মনে করছেন মশাই, স্পেনথেকে ফিরে এসেই স্ত্রী বেশ শান্ত হয়ে গেল। না, ভুল করছেন আপনি। স্বামী তাকে কিছুই বললে না, এই জন্যই ত তার সাহস আবার বেড়ে গেল। স্পেনদেশের পরে সে ধরল এক অফিসারকে রোনদেশী এক নাবিক, তার পরে এক গায়ক এবং তার পরে—। আর সবইকি জানি আমি? আর প্রতিবারেই সেই এক ব্যাপার—সেই এক তামাসা। স্ত্রী চলে যায় স্বামী কাঁদে, সে ফিরে আসে, স্বামী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘরে ডেকে নেয়। প্রতিবারেই স্ত্রী ফিরে আসে স্বামী তাকে গ্রহণ করে বিনা প্রতিবাদে। ভেবে দেখুনদেখি স্বামীর ধৈর্য্যটা! কিন্তু এত করেও কোন লজ্জা নেই স্ত্রীলোকটার। বেশ প্রফুল্লই দেখা

যেত তাকে। বড় বড় চোখ দুটো মেলে হেসেই কথা বলত সবার সঙ্গে। আবার কখনো যান যদি বোকেয়ারে এই পথে—

—আরে একটু চুপ করোনা দয়া করে, পায়ে পড়ছি তোমার।

তার চোখে মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন সুস্পষ্ট ফুটে উঠল।

ঠিক এমনি সময়ে গাড়ী থামল। আমরা অঁগোলরের গোলাবাড়ীতে পৌঁছেছি, বোকেয়ারবাসী লোক দুজন নামবে এখানে। বেশ শপথ করে বলতে পারি ওদের ধরে রাখবার কোন ইচ্ছাই ছিলনা আমার। রুটিওয়ালা প্রাঙ্গনের মধ্যে প্রবেশ করল সেখান থেকে আর একবার তার হাসির শব্দ শুনা গেল।

লোকগুলি চলে যেতে গাড়ীটা অনেকটা হালকা মনে হ'ল। কামার্গের লোকটীও আর্লে'র পথে নেমে গেল। ড্রাইভার ঘোড়ার পাশে বসেছিল। গাড়ীর উপরে শুধু আমরা দুজন—ছুরিওয়ালা আর আমি। দুজনেই আমরা আগের মতই নিজ নিজ জায়গায়, কারো মুখেই কোন কথা নেই। গরম পড়ছিল খুব। এক একবার মনে হ'ল আমার চোখ বুজে আসছে, মাথা ভারী হয়ে আসছে। কিন্তু ঘুম? সে অসম্ভব। কানের মধ্যে কেবল বাজছিল—একটু থামোনা, পায়ে পড়ছি তোমার।" অন্তরের কতখানি বেদনা, কতখানি হাহাকারে ভরা কথাগুলি অথচ কি শান্ত। হতভাগ্য বেচারা! ও নিজেও একটু ঘুমোলনা, দেখলাম, দুই কাঁধ তার কাঁপচে, হাতদুটা নড়চে ঠকঠক করে-যেন বৃদ্ধের হাতের মত। চোখে তার জল—সে কাঁদছিল—

ড্রাইভার চীৎকার করে উঠল—"অই যে তোমার মিল।" চাবুক দিয়ে দেখাল পাহাড়ের দিকে—চূড়ার উপরে দেখলাম আমার মিল—দুই পাখা তার উড়ছে পতপত করে প্রজাপতির পাখার মতই।

আমি নামবার জন্ত তাড়াতাড়ি করছিলাম। ছুরিওয়ালাকে পাশ

কেটে চলে যাচ্ছিলাম আমি, মস্ত বড় টুপীটার ভিতর দিকে একবার মুখ-খানা দেখতে চেষ্টা করলাম তার। হতভাগ্য ! আমার ইচ্ছা সে বুঝতে পেরেছিল কিনা কি জানি। হঠাৎ মাথা তুলল সে, তার দৃষ্টিরসঙ্গে আমার দৃষ্টি মিলল।

আমার দিকে চেয়ে বললে, তার কণ্ঠস্বর গম্ভীর—

ভালক'রে একবার চেয়ে দেখুন দেখি আমার দিকে। যদি কোনদিন শোনেন বোকেয়ারে এক হতভাগ্য আছে, বলতে পারবেন সে আপনার অপরিচিত নয়।

এক বিমর্ষ ক্লান্ত প্রতিমূর্ত্তি, চোখদুটা কোটরে বসে গেছে। চোখে অশ্রু কিন্তু কণ্ঠস্বরে কেমন একটা ঘৃণাভরা। মনে হল-এ ঘৃণা দুর্ব্বলের ক্রোধ।



আলে´সিয়েন

মিল থেকে নেমেই গ্রামের পথে নেটেলগাছে ঘেরা একটা বড় খামার বাড়ী, তার পাশ দিয়েই যাবার পথ। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাড়ী এটা, লাল টালির ছাদ, সামনেটা বেগ্নে রংএর, ছাদের উপরে গোলাঘর, তার কাছেই যাঁতা তুলবার কপিকল, একপাশে একগাদা শুক্না খড়।

বাইরে থেকে বাড়ীটা দেখে আমার মনের অবস্থা এমন হয় কেন? এর রুদ্ধ দ্বার আমার হৃদয়কে এমন দুরু দুরু কাঁপিয়ে দেয় কেন? কারণ জানতামনা ঠিক তবুও রক্ত আমার জমে শীতল হয়ে যায় যেন। মনেহয় চারদিকে যেন বড় বেশী নির্জ´নতা। রাস্তাদিয়ে লোক চলে কিন্তু কুকুর ডাকেনা, মুরগীগুলি পালিয়ে যায় কিন্তু চীৎকার করেনা, আর অভ্যন্তরে— বিন্দুমাত্র সাড়াশব্দ নেই সেখানে, গাধার গলার ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাজে না। জানালায় সাদা পরদা ঝুলছিল, ছাদ থেকে ধোঁয়া উঠছিল, তা না হলে বোঝবার উপায় ছিলনা, এবাড়ীতে লোকজন বাস করে।

কাল মধ্যাহ্নে গ্রামথেকে ফিরছিলাম আমি। মাথার উপরে প্রখর সূর্য্য, রোদ থেকে নিজেকে বাঁচাতে ছায়াছন্ন দেয়ালের গা ঘেসে চলছিলাম। খামারের সাম্নে দেখলাম রাস্তায় ভৃত্যগণ নিঃশব্দে গাড়ীতে খড় বোঝাই করছে। গৃহদ্বার উন্মুক্ত, যেতেযেতে চোখ পড়ল আমার ভিতরের দিকে। দেখলাম ঘরের ঠিক মাঝখানে শ্বেত পাথরের এক টেবিলের উপর কনুইটা ভর দিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। মাথার চুল তাঁর একেবারে সাদা হয়ে গেছে, পরণের বস্ত্র শত-

ছিন্ন,গায়ের জামাটা শরীরের অনুপাতে খুবই ছোট। একটু দাঁড়ালাম দেখে। একজন আমাকে বললে খুব আস্তে আস্তে—

—দেখছেন কি! চুপ, কোন কথা বলবেন না। ইনিই এ বাড়ীর মালিক। ছেলে মারা যাওয়ার পর থেকেই ওঁর এই অবস্থা।

এই সময়ে ছোট একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এক প্রৌঢ়া রমণী বাড়ীতে ঢুকলেন। রমণীর পরণে কালো পোষাক, প্রার্থনা থেকে ফিরছিলেন তিনি।

—এই দেখুন, গৃহকর্ত্রী প্রার্থনা থেকে ফিরছেন। ছেলে মরেচে যে দিন তার পর থেকে রোজই তিনি গির্জ্জায় যান। আজ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কি শুনবেন সে কথা! দেখুন পিতা আজও সেই মৃতের বস্ত্র পরে আছেন, কেউ তাকে এ ছাড়াতে পারেনি.........

......আরে একটু তাড়াতাড়ি করোনা। একেবারে কোন কাজেরই নও তোমরা!

গাড়ী চলবার জন্য তৈরি হ'ল। আমার ইচ্ছা হ'ল এ ইতিহাসটা পুরোপুরি শুনেনেই। তাই গাড়ীর উপরে একটু স্থান চাইলাম, আর সেই খড়ের গাদার উপর বসে বসেই এই ইতিহাস আমি শুনেছি সেদিন।

তার নাম ছিল জান্। বিশবছরের যুবক সে। সবাই ভালবাসত তাকে। বালিকার মতই নম্র সে, কিন্তু দেখতে বেশ শক্তিশালী, দৃঢ় দেহ। চেহারা সুন্দর, রাস্তাদিয়ে চলেযেতে মেয়েরা সব চেয়ে থাকত তার দিকে। কিন্তু সমস্ত চিন্তায় সমস্ত ভাবনায় জড়িয়েছিল কোন এক আর্লেসিয়েন। সেই কবে লিস দ্য আর্লে একবার তাকে দেখেছিল সে, বালিকা সেজেগুজে দাঁড়িয়েছিল তার সামনে—তার পর থেকে আজ

পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাকে ভুলতে পারেনি। এ বাড়ীতে আগে এই প্রণয় ব্যাপারটা পছন্দ করতনা কেউ। এর কারণ মেয়েটার নামে দুর্ণামছিল, অনেককে প্রলোভনে ফেলে প্রতারণা করেছে নাকি সে। তা ছাড়া তার পিতামাতাও এদেশের নয়।

কিন্তু জান তার আর্লে'সিয়েনকে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই সে বললে—

ওকে না পেলে আমি মরে যাব।

সবাই দেখল এরকম অবস্থা আর চলেনা। তাই ঠিক হ'ল ফসল উঠলেই ওদের বিয়ে হবে।

এক রবিবার সন্ধ্যায় সবাই একত্র হয়েছিল নিমন্ত্রণ ভোজে। প্রায় বিয়ের ভোজের মতই আয়োজন। কেবল কন্যা উপস্থিত ছিলনা, কিন্তু তার স্বাস্থ্য চেয়ে মদ পান চলছিল সবপক্ষ থেকেই। এই সময়ে হঠাৎ একটা লোক এসে দরজার কাছে দাঁড়াল, কম্পিত কণ্ঠে বললে মাষ্টার এস্তেভের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চায় সে। এস্তেভ উঠে বাইরে গেলেন।

আগন্তুক বলতে লাগল—মাষ্টার, আপনার ছেলের আপনি বিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু কার সঙ্গে একবার সন্ধান করেছেন কি? আজ দুই বৎসর ধ'রে সে আমার সঙ্গে আছে। এই নিন তার প্রমাণ। এসব তারই চিঠি! তার পিতা মাতা সবই জানেন, আমাকে কথাও দিয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন থেকে তাঁরা আপনার ছেলের সন্ধান পেয়েছেন সেই দিন থেকে মেয়ে কিংবা তার বাপ মা কেউ আমাকে চায় না। কিন্তু আমার বিশ্বাস এর পর আর তার আর একজনের স্ত্রী হওয়া সম্ভব ও নয়।

এস্তেভ কোন উত্তর করলেননা। নিবিষ্ট মনে চিঠিগুলি তিনি পড়ে দেখছিলেন। তার পরে বললেন—আচ্ছা, কিন্তু ভিতরে এসে কিছু

মস্কটের রস পান করবেন না?

লোকটা উত্তর করলে—ধন্যবাদ আপনাকে। অনুগ্রহ করে একবার ভেবে দেখবেন সমস্ত ব্যাপারটা। আমার দুঃখ যতটা তৃষ্ণা ততটা নেই।

লোকটা চলে গেল।

পিতা ভিতরে প্রবেশ করলেন। টেবিলের কাছে এসে বসলেন তিনি। ভোজের আনন্দ পূর্ণদ্যোমে চলল আবার।

সন্ধ্যার পরে মাষ্টার এস্তেভ ছেলেকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন মাঠের দিকে। তাদের বহুক্ষণ কাটল সেখানে! ফিরে এলেন যখন অনেক রাত, এস্তেভপত্নী তখনও জেগে বসে আছেন।

ছেলেকে কোলের কাছে টেনে মাষ্টার এস্তেভ পত্নীকে সম্বোধন করে বললেন—ওকে কাছে ডেকে নাও গিন্নী, ও দুর্ভাগা।

এর পরে কেউ কোনদিন আলে´সিয়েনের নাম তার মুখে শোনেনি কখনও। ভালবাসা তার তাই বলে নিভে যায় নি, স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল বিয়ে সে করবে না কাউকে। সবাই বলত, হতভাগ্য জান! দুঃখে মরে যাচ্ছে ও! মাঝে মাঝে মুখ বুজে চুপকরে ঘরের মধ্যে এক কোণে বসে সমস্ত দিন কেটে যেত তার। আবার কোনদিন বা মাঠের কাজে লেগে যেত, একাকী অন্ততঃ দশজনের কাজ করে তবে সে আসত সেখান থেকে। সন্ধ্যা হলে আলে´র পথধরে চলত সে, গ্রামের গির্জ্জায় ঝড়ে ভাঙ্গা ঘড়িটা যেখানে ঝুলছে সেই পর্য্যন্ত এগিয়ে যেত, তার পরেই ফিরে আসত আবার। এর চেয়ে দূরে যেতে কেউ কখনো দেখেনি তাকে।

খামারের লোকগুলি দেখত তাকে সর্ব্বদা ক্লান্ত, সর্ব্বদা একাকী কিন্তু কি করবে তারা? তারা সবাই আরও দুর্ভাগ্য আশঙ্কা করত। একদিন টেবিলের কাছে বসেছিল সবাই। ছেলেকে কাছে ডেকে মা বললেন,

দুই চোখ দিয়ে তার জল ঝরে পড়ছিল।—

—জান্, আমার কথা শোন বাবা, তুই যদি একান্তই তাকে চাস, তাকেই এনে দেব তোর জন্য। কথা শুনে পিতা লজ্জায় মাথা হেট করলেন।

কোন উত্তর না করে জান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিজানি কেন সেদিন থেকে চেহারা হাবভাব তার বদলে গেল। জান একেবারে নূতন মানুষ হয়ে পড়ল। সর্ব্বদাই সে যেমন প্রফুল্ল তেমনি হাসিখুসি। হয়ত পিতামাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই এপথ ধরেছিল সে। সেদিন থেকে বল নাচে, রেস্তোরাঁতে সর্ব্বত্রই আবার দেখা যেতে লাগল তাকে। ফাঁভিয়ের পক্ষ থেকে ফারান্দোল নাচে সমস্ত ব্যবস্থা করেছিল সে নিজে অগ্রণী হয়েই।

পিতা বললেন—ও সেরে গেছে। কিন্তু মাতার ভয় ছিল, সর্ব্বদাই চোখে চোখে রাখতেন তিনি ছেলেকে। ছোট ভাইকে নিয়ে জান ঘুমোত গোলাঘরের ঠিক পাশেই। হতভাগিণী বৃদ্ধা এরই পাশের ঘরে তাঁর নিজের শয়ন ব্যবস্থা করেছিলেন ছেলেকে দেখবেন বলে। খামারের লোকেরা খোজ খবর নিত সবাই।

সেণ্ট এলোয়ার উৎসব এল। এলোয়া খামার দেবতা। সমস্ত গ্রাম আনন্দে মেতে গেল। সমস্ত গৃহে সাজ সজ্জা সমস্ত গৃহেই মদের নিমন্ত্রণ। বাজি পোড়ান চলল—সমস্ত আকাশে যেন আগুনের ছড়াছড়ি। নেটেল পাতার রংএর আলোগুলি সমস্ত গ্রাম খানিকে এক নূতন রূপে সাজিয়ে তুলল। চারিদিকে শব্দ—জয় সেণ্ট এলোয়ার জয়! জীবন পণ করে চলল সবার ফারান্দোল নাচ। ছোট ছেলে তার নূতন পোষাকটা পুড়িয়ে ফেলল। আজ জানের ও যেন আনন্দের সীমা নেই। মাকে গিয়ে জানালে তার সঙ্গে নাচবে সে। নিজের সৌভাগ্য দেখে

হতভাগ্য বৃদ্ধার দুই চোখ ভেঙ্গে কান্না এল আজ।

মধ্যরাত্রে সবাই শয্যায় আশ্রয় নিল। জগতে এমন প্রাণী নাই যার নিদ্রার প্রয়োজন নাই। কিন্তু জানের চোখে ঘুম নেই। পরদিন ছোট ছেলে বলেছে সমস্ত রাত্রি আর্ত্তনাদ করেছে সে। না, এর চেয়ে তার মৃত্যু ভালো।

পরদিন খুব প্রত্যুষে, বৃদ্ধা তখন ঘুমে। হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন ছুটে ঘরের মধ্যদিয়ে চলে গেল। ভাবী দুর্ঘটনার ছায়া পড়ল হয়ত তার মনে।

—জান্, তুই নাকি।

জান উত্তর করল না। সে তখন সিঁড়ির উপরে।

বৃদ্ধা তাড়া তাড়ি শয্যা ছেড়ে উঠে এলেন।

—জান, কোথায় যাচ্ছিস তুই ?

জান গোলাঘরে উঠে গেল। মাও উঠলেন পিছনে পিছনে।

—জান, বাবা, ভগবানের দোহাই—

জান সজোরে দরজা বন্ধ করল, খিলটা টেনে দিল, বাইরে থেকে শব্দ শোনা গেল।

—জান্, বাবা আমার, একটা কথা বল। কি করছিস তুই এসব!

অন্ধকারে কম্পিত হস্তে বৃদ্ধা দরজার খিল হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন।

হঠাৎ মনে হ'ল একটা জানালা খুলে গেল। উপর থেকে কি যেন ভারী একটা ধপাস করে পড়ল নীচে প্রাঙ্গনের মধ্যে। তার পরে আর কিছু শোনা গেল না।

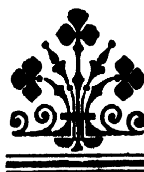
হতভাগ্য পড়তে পড়তেও বলছিল—

—আমি যে ভালবাসি তাকে, খুবই ভালবাসি—তাই চলে যাচ্ছি আমি দূরে।

হায় হতভাগ্য হৃদয়! কোন ভুলই ত একে মেরে ফেলতে পারে না।

সকালে গ্রামের লোক জানতে এল এন্তেভের বাড়ীতে কান্না কেন।

উঠানের মধ্যে পাথরের টেবিলের ধারে মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে বসে মা। অঙ্গ বস্ত্রে ঠিক্ আচ্ছাদন হয়নি তার—করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করছিলেন তিনি। মৃতদেহ রক্ত ও পুষ্পে আচ্ছন্ন।



॥ মোপাসাঁ ॥

পিতা পুত্র

কতকগুলি বালক ও শিকারীর দল শিকারের ব্যাগ নিয়ে ভিতরে প্রবেশকরলে, সাম্‌নে আপেল গাছে বাঁধা কুকুরগুলি সেইদিকে চেয়ে প্রলুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। বাড়ীটা দেখতে ঠিক কৃষকের খামারও নয়, আবার জমিদারের সুবৃহৎ অট্টালিকা বলেও মনে হয় না। তবুও বেশ সঙ্গতিশালী কৃষকেরই বাড়ী এটা। রান্নাঘর বেশ বড়, এবং এইটেই হ'ল খাবার ঘর। সেখানে বসে আহার ও মদ পান করছিলেন পিতা পুত্র হটো. ম'সিয়ে বারমোঁ,—ইনি ট্যাক্স আদায় করেন, আর ম'দারু, তিনি উকিল। বছরের শিকার আজ আরম্ভ হবে। তারই জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন সবাই।

পিতা হটো একটু গর্ব্বিত--ভূসম্পত্তি তার অবহেলার বস্তু নয়। সমাগত অতিথিরা সবাই চলেছেন শিকারে তারই অধিকারে। গর্ব্বিত সুরে সেই কথাই বলছিলেন তিনি। নর্ম্যানতিনি, বিরাট দেহধারী শক্তিশালী, দৃঢ় অস্থিগুলি তার সুপুষ্ট; তিনি পল্লীকৃষক. তবুও সম্ভ্রান্ত ধনী. মান্যগন্য, আপন ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে একটু গর্ব্বিত। পুত্র সিজারকে তিনি কলেজের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়েছিলেন, ইচ্ছাছিল পুত্র শিক্ষিত হোক। কিন্তু পাঠ তার এখানেই সমাপ্ত হয়, ভয় হ'ল পিতার, পুত্র পাছে রুচি সম্পন্ন ভদ্রলোক হ'য়ে বসে, পাছে তাঁর ভূমির অযত্ন হয়।

সিজার হটো পিতার স্তারই লম্বা, কিন্তু একটু কৃশ। পিতার সুপুত্র সে বিনীত, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, পিতৃভক্ত, পিতার ইচ্ছা এবং মতের প্রতি সর্ব্বদা শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

ম'সিয়ে বারমে'। যিনি ট্যাক্স আদায় করেন,--বেশ হৃষ্টপুষ্ট, খর্ব্বকায়, রক্তাভ গণ্ডে তার কালো কালো শিরাগুলি ফুটে উঠেছে, দেখে মনে হচ্ছে মানচিত্রের গায়ে নদনদীর এবং উপনদীর দল এঁকেবেঁকে চলেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন :—

—"আচ্ছা খরগোস—খরগোস পাওয়া যায় ত ?"

বৃদ্ধ হটো উত্তর করলেন—"খুব, যত চাও তুমি, বিশেষতঃ পিসাতিয়ে অঞ্চলের তো কথাই নেই" নোটারী ম'দারু বেশ মোটা সোটা কিন্তু মলিন, রোয়েন থেকে একটা আনকোরা নূতন শিকারি পোষাক কিনে এনেছেন তিনি, বেল্ট সহ। জিজ্ঞাসা করলেন—"তাহ'লে কোনপথে যাব আমরা ?"

—"এই যে, এখান থেকে একেবারে নীচে নেমে। তিতিরগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব সমতল মাঠে, সেখানেই ওদের পাব।"

বৃদ্ধ হটো উঠে পড়লেন। তাঁকে অনুসরণ করে সবাই নিজ নিজ বন্দুক কোণ থেকে তুলে নিলে, একবার পরীক্ষা করে দেখলে, মাটিতে পা ঠুকে দেখে নিলে বুটগুলি ঠিক আছে কি না, ব্যবহারে এখনও তারা নরম হয়নি। তারপর সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ল, কুকুরগুলি পিছনের পা'র উপর ভর দিয়ে জিহ্বা লেহন করছিল, সামনের থাবা গুলি শূন্যে তুলে ধরেছিল।

কথামত নীচের দিকেই তারা চলল। এটা ক্ষুদ্র এক উপত্যকা, অথবা লম্বা একটানা কতকটা অনুর্ব্বর উচুনীচু জমি। এ জমি কখনো চাষ হয়নি, মাঝে গর্ত্ত, ঝোপে ঢাকা, শিকারের পক্ষেই বেশ উপযুক্ত স্থান।

পরস্পর একটু দূরে দূরে সবাই চলল, বৃদ্ধ হটো সবার দক্ষিণে, বাঁদিকে যুবক হটো, মাঝখানে দুই অতিথি। শিকারী চলছিল সঙ্গে, তার পশ্চাতে যাচ্ছিল ব্যাগনিয়ে লোকগুলি। এক শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করে রইল

সবাই, যখন প্রথমবার গুলি হবে, হৃদয় দুরুদুরু কাঁপবে, কম্পিত অঙ্গুলি ট্রিগার স্পর্শ করে থাকবে।

হঠাৎ বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। বৃদ্ধ হটো গুলি করেছেন। সবাই দাঁড়িয়ে গেল, একটা তিতির ঝাঁক থেকে খসে পড়ল, ঝোপের নীচে গর্তের মধ্যে। তাকে অনুসরণ করে বৃদ্ধ দ্রুতপদে এগিয়ে ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রায় সেই মুহূর্তেই শোনা গেল আর একটা শব্দ! মঁসিয়ে-বারমোঁ চীৎকার করে উঠলেন—হা! হা! নিশ্চয়ই খরগোস পড়েছে।

সবাই অপেক্ষা করেছিল, বিস্ফারিত নয়নে চেয়েছিল ঝোপের দিকে, ঘন বন ভেদ করে দৃষ্টি তাদের সেখানে যেতে পারছিল না।

নোটারী হাত তালি দিয়ে চীৎকার করে উঠল—পেলে কি?

কিন্তু মঁসিয়ে হটোর কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

সঙ্গী শিকারীর দিকে চেয়ে সিজার তখন বললে—যাওত জোসেফ, ওকে গিয়ে একটু সাহায্য করো, আমরা অপেক্ষা করছি এখানে।

বৃদ্ধ জোসেফ কৃশ, তার হাত পায়ের গিটগুলি একটু স্ফীত। ধীরে ধীরে ডিচের মধ্যে সে নেমেগেল, শৃগালের সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যেকটি ঝোপ উল্টে দেখতে লাগল। হঠাৎ চীৎকার করে উঠল সে—শীগগির এস, এদিকে সর্ব্বনাশ হয়েছে।

সবাই তাড়াতাড়ি ছুটে গেল ঝোপের মধ্য দিয়ে।

জ্ঞানশূন্য বৃদ্ধ হটো কাত হয়ে পড়েছিলেন একদিকে, দুই হাত তার পেটের উপর, বন্দুকের গুলিতে ছিঁড়ে গেছে সেখানটা, রক্ত পড়ছিল অনর্গল ধারায়। বন্দুক ছেড়ে মরা পাখিটা তুলতে গিয়েছিলেন তিনি, হাত থেকে বন্দুকটা পড়ে গিয়েই দ্বিতীয়বার গুলি ছুটেছে, নাড়ী-

ভুড়ি ছিড়ে গিয়েছে সব। সবাই মিলে খাদের মধ্য থেকে তাকে বাইরে নিয়ে এল, কাপড় চোপড় খুলে ফেলল গা থেকে,—কি ভীষণ ক্ষত চিহ্ন, তার মধ্য থেকে নাড়ীভুড়ি সব বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। কোনমতে ক্ষত বেঁধে নিয়ে এল তাকে বাড়ীতে, ডাক্তার ডাকা হ'ল, যাজককেও ডেকে পাঠান হ'ল।

একটা চেয়ারের উপর ব'সে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল সিজার হুটো, তার দিকে চেয়ে ডাক্তার বললেন—"খুবত ভাল মনে হচ্ছেনা, বাবা।"

কিন্তু ক্ষত বাঁধা হ'লে আহত ব্যক্তি ধীরে ধীরে আঙ্গুলগুলি নাড়াতে লাগল, তার মুখ খুলল, এর পরে তার চোখও খুলে গেল, চতুর্দ্দিকে ক্লান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল, মনে হ'ল সমস্ত ব্যাপারটা মনে করে নিচ্ছে সে। তার পরে বিড়বিড় করে বলতে লাগল—হায় ভগবান! এ আমার শেষ ঘনিয়ে আসল!

ডাক্তার তার হাতখানা ধরে ফেললেন।—

—না, না একি বলছেন আপনি? কয়েকদিন একটু বিশ্রাম করুন, তাহ'লেই সেরে যাবে সব, বিশেষ কিছু নয় এ।

কিন্তু বৃদ্ধ হুটো আবার বললেন—"আমি বুঝেছি এ আমাকে শেষ করেছে, আমার পেট ফাঁক হয়ে গেছে।" তার পরে হঠাৎ বলে উঠলেন—"যদি সময় পাই তো ছেলের কাছে কয়েকটা কথা বলে যেতে চাই।"

পুত্র নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছিল খুবই, কিন্তু অশ্রু তাহার গড়িয়ে পড়ছিল অজস্র ধারায়, বালকের মতই বলছিল সে—পিতা! পিতা! পিতা আমার!

কিন্তু পিতা দৃঢ়কণ্ঠে তাকে বললেন—এসো এদিকে! কেঁদোনা, কান্নার সময় নয় এ। তোমাকে কিছু বলব আমি, এখানে বস,

আমার কাছে এসে। বেশী সময় লাগবেনা আমার, শীগগিরই সব শান্ত হবে। তোমরা আর সবাই আমাদের দুজনকে এক মিনিটের জন্য রেখে একটু বাইরে যাও।

পিতা পুত্রকে রেখে সবাই বাইরে চলে গেল।

সবাই চলে যেতেই পিতা বলতে লাগলেন—শোন পুত্র! তোমার বয়স এখন চব্বিশ, সব কথা এখন তোমাকে বলা চলে। তা ছাড়া আমরা একে যে ভাবে দেখি সে ভাবে দেখারও বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। হয়ত জানো তুমি সাত বছর আগে তোমার মা স্বর্গে গেছেন, আর আমার বয়স এখন পয়তাল্লিশের বেশী নয়। উনিশ বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল। কি ঠিক নয়?

অব্যক্ত কণ্ঠে পুত্র উত্তর করল—হাঁ, ঠিক।

—তাহ'লে সাত বছর হ'ল তোমার মা মারা গেছেন, আর সাত বছরই আমি বিপত্নীক। আচ্ছা, আমার মতো একজন লোকের পক্ষে সাইত্রিশ বছরে বিপত্নীক থাকা! কি বল, ঠিক বলছি কি না?

পুত্র উত্তর করল—হাঁ, ঠিক।

বৃদ্ধ হটো নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলেন না, যন্ত্রনায় মুখ বিকৃত হচ্ছিল মাঝে মাঝে। বলছিলেন তিনি—হায় ভগবান। কি যন্ত্রণা! আচ্ছা, বুঝেছ তো? একা থাকার জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়নি কিন্তু তোমার মার স্থানে আর কেউ আসে এও চাইনি আমি কারণ তার কাছে এ আমি শপথ করেছিলাম। তাহ'লে—বুঝলে ত?

—হাঁ, বাবা।

—তাই রোয়েনে এক কুমারীকে রেখেছিলাম আমি; ১৮ নম্বর এপাঁরলা ষ্ট্রীট, তিনতলা দ্বিতীয় দরজা। তোমাকে বলে যাচ্ছি সব, ভুলে যেওনা যেন। কিশোরী সে, একদিনের জন্যও আমার

সঙ্গে ব্যবহার তার খারাপ হয়নি। শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, ভালবাসায় সে ছিল একজন রমণীর পক্ষে যা হওয়া সম্ভব। বুঝলেত তুমি ?

—হাঁ, বাবা।

—তাই বলছি, যদি আমি চলে যাই, তার কাছে আমি কিছু ধারি—তাকে ভবিষ্যতে অভাবের কবল থেকে আমার মুক্তি দিয়ে যাওয়া উচিত। কি, বুঝলে ?

—হাঁ বাবা।

—বলেছিত আমি খুব ভাল মেয়ে সে। তুমি এবং তোমার মার স্মৃতি, আর আমরা তিনজনে এই বাড়ীতে বাস করেছি—এ নইলে আমি তাকে এখানেই নিয়ে আসতাম। হয় ত তাকে বিয়ে করতাম আমি। শোন, শোন তুমি—একটা উইল করে যেতে পারতাম কিন্তু তা আমি করিনি। সে ইচ্ছা আমার ছিল না কারণ কোন কিছু লিখে পড়ে করা উচিত নয়। আর এ সব জিনিস—বৈধ সন্তানের অন্যায় করা হয় এতে—সবারই সর্ব্বনাশ আনে এ। দেখ, উকিলের প্রয়োজন কি ? কখনো যাবেনা এদের কাছে। আজ আমি ধনী তার কারণ জীবনে এদের সাহায্য নেইনি। বুঝলে, বাবা ?

—হাঁ বাবা।

—তাহ'লে আরও শোন, বেশ মনোযোগ দিয়ে। সেই জন্যই কোন উইল করিনি আমি, সে ইচ্ছা আমার হয়নি কখনো। তা ছাড়া আমি জানতাম তোমাকে। তোমার অন্তঃকরণ আছে, তোমার লোভ নাই, বেশী চাওনা তুমি। মনে মনে ঠিক করেছিলাম আমার মৃত্যুর আগে সব কথাই বলে যাব তোমাকে, তাকে তুমি ভুলে না যাও। শোন তবে আবার—আমার মৃত্যু হ'লে একবার যাবে তুমি

তার কাছে, বেশী দেরী ক'রোনা—এমন ব্যবস্থা করবে আমার স্মৃতি যেন তার কাছে অপরাধী না হয়। ঢের আছে তোমার এ থেকে অনায়াসেই কিছু দিতে পার তুমি—যথেষ্টই আমি রেখে গেলাম তোমার জন্য। শোন—যে কোন দিন গিয়ে বাড়ীতে পাবে না তাকে। বুভোয়াসিন ষ্ট্রিটে ম্যাডাম মরোর ওখানে সে চাকরী করে। বৃহস্পতিবার যাবে তার কাছে। এই দিন সে আমার জন্য অপেক্ষা করে। গত ছয় বৎসর ধরে এই ছিল আমার দিন। হতভাগিনী! কাঁদবে সে! সব কথাই বলে যাচ্ছি তোমাকে, কারণ আমি তোমাকে জানি। এসব কথা সর্ব্বত্র বলা চলে না, নোটারীর কাছেও না, যাজকের কাছেও না। এমনি হয়—সবাই জানে কিন্তু খুব দরকার না হ'লে কেউ এ কথা প্রকাশ করে না। তা ছাড়া বাইরে কারও কাছে এ বলা চলে না। আমি জানি আমার পরিবার তুমি একা, বুঝলে?

—হাঁ, বুঝেছি বাবা।

—শপথ করছ তবে?

—হাঁ, বাবা।

—অনুরোধ করছি তোমাকে, প্রার্থনা করছি আমি—ভুলে যেও না যেন। বার বার আমি বলছি তোমাকে।

—না, ভুলবোনা, বাবা।

—তুমি নিজে যাবে। আমি চাই তুমি নিজে দেখেশুনে সব ব্যবস্থা করবে।

—হাঁ, বাবা।

—দেখবে তখন সবই বলবে সে তোমাকে। এর বেশী আর কি বলব তোমাকে আমি? তুমিত প্রতিজ্ঞাই করেছ।

—হ্যাঁ, বাবা।

—বেশ! কাছে এস এবার। বিদায় তবে! জানি আমি এখনি আমার মৃত্যু হবে। ওদের বল, এবার আসতে পারে।

যুবক সিজার তখনও কাঁদছিল, পিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, আলিঙ্গন করলে সে। সিজার চিরদিন পিতার বাধ্য আদেশানুযায়ী দ্বার খুলে দিল, সর্ব্বাঙ্গে শ্বেত পরিচ্ছদ জড়িয়ে যাজক ভিতরে প্রবেশ করল, হাতে তার পবিত্র তৈল।

কিন্তু মরনোন্মুখ বৃদ্ধের চোখ এর আগেই বন্ধ- হয়েছে কিছুতেই খুললনা আর সে দুটী, কোন কথারই উত্তর দিলেননা তিনি, এমনকি ইঙ্গিতেও বললেন না একবার, বুঝেছেন কিনা।

এতদিন ধরে কত কথাই না বলেছেন তিনি কিন্তু আজ সে মুখ নীরব। আপন অন্তরকে অনুভব করছিলেন, শান্তিতেই মরতে চেয়েছিলেন। কি প্রয়োজন তাঁর ভগবানের প্রতিনিধিকে, কি প্রয়োজন সব কথা স্বীকার ক'রে তার কাছে? সবই ত বলেছেন তাঁর ছেলের কাছে, সেই ত তার পরিবার।

মৃত্যুর পূর্ব্বের সবকাজ সুসম্পন্ন হ'ল, পবিত্র করান হ'ল, মুক্তির সনদ পেলেন তিনি যাজকের কাছ থেকে। চারিদিকে আত্মীয় বন্ধু এবং নতজানু ভৃত্যবর্গ পরিবৃত হ'য়েছিলেন তিনি, মুখ দেখে মনে হয় মরেন নি তখনও।

মধ্যরাত্রে মৃত্যু হল তাঁর, চারঘণ্টা ধরে তিনি শয্যায় এপাশ ওপাশ করছিলেন—সে কি ভয়ানক যন্ত্রণা!

মঙ্গলবার সমাধি হ'ল। শিকার আরম্ভ হয়েছিল রবিবার। শ্মশান থেকে ফিরে সিজার হটোর সমস্ত দিন কাটল কেঁদে। সে রাত্রে তার প্রায় ঘুম হ'ল না, ভোরে জেগে উঠে নিজেকে তার

আরও বিমর্ষ লাগল, জিজ্ঞাসা করল নিজেকে নিজে কি করে বাঁচবে সে।

তবুও ভুলতে পারছিল না সে—মৃত পিতার শেষ ইচ্ছা তাকে পূর্ণ করতেই হবে, পরদিন যেতে হবে তাকে রোয়েনে, ক্যারোলিন দোষ্যার সঙ্গে তার দেখা করতে হবে। ১৮ নম্বর এপারলাঁ ষ্ট্রিটে তিন তলায় দ্বিতীয় দরজা তার ঘর। বহু বার এই নাম ও ঠিকানা আবৃত্তি করলসে শিশুর মুখে প্রার্থনার মতই, যেন কোনমতেই ভুলে না যায়। তারপরে আবৃত্তি চলছিল কিন্তু মনের ভাবনা গেল থেমে, এমনি তন্ময় হয়ে পড়েছিল সে।

পরদিন বেলা আটটার সময় সহিস তার গ্রেইনডোরজ অশ্বকে সাজিয়ে নিয়ে এল, নর্ম্যান্ দেশী ঘোড়া লম্বা কম্পিত পা ফেলে রওনা হ'ল এইনভিল থেকে রোয়েন। সিজার তার কাল ফ্রক কোট পরেছিল, মাথায় ছিল তার সিল্কের টুপী, পায়জামা জুতার নীচ পর্য্যন্ত মোড়ান ছিল তার। এ তার শোকের দিন তাই নীল কোট পরেনি সে।

রোয়েনে যখন সে প্রবেশ করল তখন বেলা ঠিক দশটা। অন্যান্য বারের মত এবারও বজাফাঁ হোটেলেই উঠল সে। ক্রোয়া মেয়ার ষ্ট্রিটে এই হোটেল। হোটেলাধ্যক্ষ সাদর-সম্ভাষণ করলে তাকে। তার স্ত্রী ও পাঁচ সন্তান সবাই তাকে অভ্যর্থনা করলে, তার দুর্ভাগ্যের কথা আগেই শুনেছে এরা! তবুও ঘটনার কথা সবই পুঙ্খানুপঙ্খ বলতে হ'ল এদের, বলতে বলতে কেঁদে ফেলল সে। পিতার স্মৃতি কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। সে ধনী, হোটেলাধ্যক্ষের তরফথেকে যত্নের কোন ত্রুটীই হ'লনা, কিন্তু কিছুই গ্রহণ করলনা সে, এমনকি এদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও খাবার পর্য্যন্ত খেলেনা। খুবই তারা ক্ষুণ্ণ হ'ল এজন্য।

তারপরে টুপীটার ধূলি ছেড়ে ফেলল, কোটটাকে ব্রাস করল সে, বুটের উপর থেকে কাদার দাগগুলি পরিষ্কার করলে, তারপর এপারলাঁ স্ট্রীটের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। কারও কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস হ'ল না তার, পাছে কেউ বুঝতে পারে, কেউ কিছু সন্দেহ করে বসে।

কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পেলেনা সে রাস্তাটা। এক যাজক চলে যাচ্ছিলেন তার সাম্‌নে দিয়ে। সিজার অবশেষে তাঁকেই বিশ্বাস যোগ্য মনে করলে, তাই জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে।

প্রায় কাছেই এসে পড়েছিল সে। প্রায় শখানেক পা এগিয়ে ডানদিকে দ্বিতীয় রাস্তাটাই হ'ল এপারলাঁ স্ট্রীট।

একটু দাঁড়াল সে এখানে। এ পর্য্যন্ত মৃতব্যক্তির আদেশ সে বন্যজন্তুর মতই অনুসরণ করে এসেছে কিন্তু মনের মধ্যে একটা উদ্বেগের ছায়া পড়ল এখন। পুত্র সে—কি করে পিতার প্রেমিকার সামনে দাঁড়াবে গিয়ে? কি করবে ভেবে পেলেনা, নিজেকে খুবই ক্ষুদ্র মনেহ'ল তার। চিরদিনের নীতি ধর্ম্ম, যুগ যুগ সঞ্চিত যে সব নীতি উপদেশ আমরা পুরুষানুক্রমে শুনে আসছি, দুর্নীতির মূলমন্ত্র জন্মথেকে এপর্য্যন্ত সে যা শিখে আসছে, এর প্রতি মানুষের অন্তরের স্বাভাবিক ঘৃণা, গ্রাম্য চরিত্রের সঙ্কীর্ণসততা সবই জেগে উঠল তার মধ্যে, ক্রমাগত পিছনের দিকেই টানছিল তাকে, লজ্জায় সে লাল হয়ে উঠল।

কিন্তু নিজের কাছে বললে সে—

—"পিতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি আমি। কিছুতেই ভাঙবনা সে প্রতিজ্ঞা আমার।"

১৮নম্বর বাড়ীর অর্দ্ধোন্মুক্ত দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলে সে। অন্ধকারাচ্ছন্ন এক সিঁড়ি পেল সামনে। তিন তলায় উঠে দেখলে একটা দরজা, তারপরেই দ্বিতীয় দরজা। একটা ঘণ্টা বাঁধা দড়ি দেখে টানলে

সেটাকে। সমস্ত বাড়ীটা প্রতিধ্বনিত হ'ল ঘণ্টাশব্দে। সে শব্দে আপাদ মস্তক কেঁপে উঠল তার। দরজা খোলা হ'লে সে দেখলে সামনে তার সুসজ্জিতা এক রমণী। রমণীর রং খুব ফর্সা নয় কিন্তু দুই গণ্ডে গোলাপি আভা ফুটে উঠেছে তাঁর। রমণী বিস্মিত হ'য়ে চেয়েছিল তার দিকে।

কিন্তু কি বলবে সে এই রমণীকে? কিছুইত সন্দেহ করেনি সে, তারই পিতার অপেক্ষা করেই ত ব'সে আছে। রমণী তাকে ভিতরে ডাকলেনা। প্রায় আধমিনিট দুজনেই তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে ছিল, তার পরে রমণী প্রশ্নের স্বরে বললে—

—"আপনি কি কিছু চান্?"

অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বললে সে—"মঁসিয়ে হটোর ছেলে আমি।"

রমণী চমকে উঠল, তার মুখখানা হঠাৎ একটু মলিন হ'ল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—

—"মঁসিয়ে সিজার?"

—হঁ্যা।

—কি, খবর কি, বলুন?

—পিতার কাছ থেকে আপনার জন্য একটা সংবাদ নিয়ে এসেছি আমি।

উচ্চৈস্বরে বলে উঠলে সে—ও! তারপরে একটু পিছিয়ে গেল সে সিজার যাতে ভিতরে আসতে পারে। দরজা বন্ধ করে সিজার রমণীর পিছনে পিছনে ঘরের মধ্যে এল। চার পাঁচ বছরের একটি ছোট ছেলে উনুনের ধারে মেঝের উপর বসে একটা বিড়াল নিয়ে খেলা করছিল। উনুনের উপর খাবার গরম হচ্ছিল, গন্ধ তার ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে।

রমণী তাকে বলল—"বসুন।" সিজার বসল, রমণী জিজ্ঞাসা করল—"তারপর?"

কিন্তু কি বলবে সে, ঠিক মাঝখানে একটা টেবিল দাঁড়িয়েছিল। তিনটা ঢাকনি ছিল তার উপর, একটা এই শিশুর জন্য, এক বোতল ক্লারেট মুখ খোলা, একবোতল সাদা মদ তখনও খোলা হয়নি। সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল সে। আগুনের দিকে পিঠ করে একটা চেয়ার, সেই-দিকে একবার চেয়ে দেখল সে। নিশ্চয়ই এ চেয়ার তার পিতার জন্য! তারজন্য অপেক্ষা করেইত বসে আছে এরা। এই যে রুটী তার জন্য, উপরটা তার তুলেফেলা হয়েছে—হটোর দাঁত খারাপ তার জন্যই। চোখ তুলে সে দেখলে তার পিতার ছবি দেয়ালের গায়ে। এই ফটোগ্রাফ তিনি এক্সিজিবিশনের বছরে প্যারিতে তুলেছিলেন। এনভিলে তাঁর শয়নকক্ষে ছিল এটা।

যুবতী আবার জিজ্ঞাসা করলে—কি খবর মঁসিয়ে সিজার?

কিন্তু একদৃষ্টে তখনও সে চেয়েছিল তার মুখের দিকে। রমণীর মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল, তার দিকে চেয়েছিল সে শুনবার জন্যই, দুই হাত তার ভয়ে কাঁপছিল।

সিজার এবার সাহস সঞ্চয় করল।

—"বাবা গত রবিবার মারা গেছেন, এবছরের শিকার আরম্ভ করেই।

কথাশুনে রমণী অভিভূত হ'য়ে পড়ল, স্পন্দহীন দাঁড়িয়ে রইল সে। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল সে—"না, এ অসম্ভব!"

তার পরে হঠাৎ চোখথেকে জল গড়িয়ে পড়ল তার, দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। এই সময়ে ছোট ছেলেটি এদিকে ফিরল, মাকে কাঁদতে দেখে সে গোঙাতে লাগল। বুঝলে সে এই

গণ্ডোগোলের মূলে এই আগন্তুক। তাই সে সিজারের দিকে এগিয়ে এল, এক হাতে তার পায়জামা ধরে, অন্য হাতে যথাসাধ্য জোরে তাকে ঘুষি মারতে লাগল উরুতে। সিজার অভিভূত হোল, কিন্তু ভেবেপেলেনা কি করবে। একদিকে এই রমণী কাঁদছে তার পিতার জন্য, অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিশু মার পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হ'ল এদের ব্যাকুলতা সমস্ত মনকে উদ্বেলিত করছে তার, দুই চোখ তার অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। নিজেকে সামলে নিতে সে কথা আরম্ভ করল—

—হাঁ, এ ব্যাপার ঘটেছে রবিবার, বেলা তখন আটটা—সমস্ত কথাই পুঙ্খানুপুঙ্খ বলে গেল সে, যেন রমণী সবই শুনছে। একটী সামান্য ঘটনাও বাদ পড়লনা, গ্রাম্য লোকের বর্ণনা ভঙ্গী নিয়ে সবই বলে গেল সে। শিশু তখনও তার আক্রমণ চালাচ্ছিল, তার গোড়ালি লক্ষ্য করে। বলতে বলতে এল সে সেইখানে যেখানে পিতা তার রমণী সম্বন্ধে বলে গেছেন, রমণী মুখ থেকে হাত নামিয়ে ফেললে, বললে—মাপ করবেন আমাকে! এতক্ষণ শুনিনি কিছুই। শুনতে ইচ্ছা হয়,—আর একবার বলতে পারেন না কি?

সমস্ত কথাই আর একবার বলে গেল সে ঠিক সেই আগের কথায়। মাঝে এক একবার থামছিল সে, কি যেন ভাবছিল এক একবার। রমণী এবার শুনছিল একাগ্র মনে, নারীর অনুভূতি নিয়েই অনুভব করছিল হঠাৎ তার কি ভাগ্য পরিবর্ত্তন বলছে এই কাহিনী। সমস্ত দেহ তার মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল আতঙ্কে, এক একবার উচ্চৈস্বরে বলে উঠছিল সে—"ও! ভগবান!"

ক্ষুদ্র শিশু মনে করল মা তার শান্ত হয়েছে, তাই সিজারকে ছেড়ে এবার মার হাতখানা এসে ধরলে, সমস্ত কথাই শুনছিল সে যেন সবই বুঝছে সে।

কাহিনী শেষ হ'লে সিজার বলতে লাগল—এখন তাঁর ইচ্ছামত আমরা দুজনে মিলে একটা ব্যবস্থা করে নিই, আসুন। আমি ধনী, যথেষ্টই রেখে গেছেন তিনি আমার জন্য। আমি চাইনা কোন কিছু অভিযোগ থাকে আপনার—

কিন্তু রমণী বাধা দিয়ে বললে—না, না মঁসিয়ে সিজার, আজ নয়, আজ নয় ওসব। হৃদয় আমার ভেঙ্গে যাচ্ছে, আর এক সময়—আর একদিন। না, আজ কিছুতেই নয়। শুনুন, যদি কিছু নিই আমি—আমার নিজের জন্য নয়—না, না আমি শপথ করে বলতে পারি আপনাকে—এই শিশুর জন্যই। তা ছাড়া টাকাটা তারই নামে থাকবে।

আতঙ্কিত সিজার কথাটাকে একবার ভাবলে, তারপরে অনুচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—

—তবে—তবে কি এই শিশু তাঁরই?

—হাঁ, তারই।

যুবক হটো ভাইএর দিকে তাকিয়ে দেখলে—কেমন একটা অজানা তীব্র বেদনা ফুটে উঠল মুখে তার। এর পরে বহুক্ষণ নীরবেই কাটল। রমণী কাঁদছিল আবার। এ অবস্থায় কি করবে সিজার ভেবেপেলেনা। একটু পরে রমণীকে বললে সে—

—আচ্ছা, এবার যেতে হবে আমাকে। আপনি কবে এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান? রমণী বলে উঠল, উচ্চৈস্বরে—না, না, যাবেন না আপনি, যাবেন না বলছি এখন, আমাকে এমিলের সঙ্গে একা রেখে যাবেন না আপনি! আমি মরে যাব তাহ'লে। আর কেউ নেই আমার এখন, এই শিশু ছাড়া কেউ নেই আমার। ও! কি দুর্ভাগ্য! কি দুর্ভাগ্য আমার মঁসিয়ে সিজার! আসুন, আর একটু

বলুন। বলুন, আরও কিছু বলুন। বলুন এই সমস্ত সপ্তাহ ধরে কি করেছেন তিনি বাড়ীতে।

সিজার আসন ছেড়ে উঠে পড়েছিল, আবার বসল—চিরদিনই বাধ্য সে।

একখানা চেয়ার টেনে রমণী উনুনের কাছে বসলে, উনুনের উপর খাবার গরম হচ্ছিল তখনও। এমিলকে সে কোলে তুলে নিলে—প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল সিজারকে। তার পিতার সম্বন্ধে এমন সব প্রশ্ন শুনে সিজারের মনে হল দুর্ব্বল রমণীহৃদয়ের সমস্তটুকু ভালবাসাই দিয়েছে এই রমণী পিতাকে তার।

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ঘটনা মনে পড়ল তার, আর একবার বলে গেল সব আনুপূর্ব্বিক। সিজার বলছিল—এত বড় গর্ত্ত হয়েছিল পেটে তার যে সমস্ত হাতখানা আপনার ঢুকে যাবে সেখানে। শুনে রমণী চীৎকার করে উঠল, চোখ তার জলে ভরে গেল আবার।

দুঃখ সংক্রামক, সিজার নিজেও কাঁদতে লাগল। অশ্রু হৃদয়তন্ত্রীকে কোমল করে। শিশু এমিলের কপোল সিজারের কাছেই ছিল, সে নত হয়ে চুম্বন করলে তাকে।

নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে রমণী বললে—হতভাগ্য শিশু! আজ ও অনাথ, কেউ নাই ওর। সিজার বললে—আর আমিও তাই!

আবার তারা নীরব হ'ল।

গৃহকর্ত্রীর স্বাভাবিক বুদ্ধি সবই দেখে, সবই ভাবতে পারে—হঠাৎ এই বুদ্ধি জেগে উঠল রমণীর অন্তরের মধ্যে—

—ম'সিয়ে সিজার, সমস্ত সকাল আপনার কিছুই খাওয়া হয়নি হয়ত!

—না, খাইনি কিছুই।

—নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত্ত আপনি। সামান্য কিছু খেয়ে নিন।

—না, না, ধন্যবাদ আপনাকে! ক্ষুধা পায়নি আমার! দুঃখের মাত্রা বড় বেশী আমার।

রমণী উত্তর করল—দুঃখ আছে তবুও সবাইকে বাঁচতে হয় আমাদের। কিছু খেতে দিই আপনাকে, অমত করবেন না আপনি এবং তারপরে আরও কিছুক্ষণ বসবেন। আপনি চলে গেলে, ভেবে পাচ্ছিনা আমার কি হবে।

আরও দু একবার না, না ক'রে সিজার সম্মত হল। আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে রমণীকে সামনে রেখে সে বসেছিল। গ্রাভী দিয়ে শুকনো এক প্লেট ট্রাইপ খেলে সে, তারপরে এক বোতল লালমদ। রমণী সাদা মদের বোতলটা খুলতে চাইলে কিন্তু কিছুতেই সিজার সম্মত হ'ল না। সিজার কয়েকবার শিশুর মুখ ধুইয়ে দিল, গ্রাভীর রসে এমিলি সমস্ত মুখ নোংরা করছিল।

এরপরে বিদায় নিতে উঠে জিজ্ঞাসা করল সে—তাহ'লে কবে আসব আমি? কখন বলতে চান এ সম্বন্ধে?

—যদি অসুবিধা না হয় আস্‌ছে বৃহস্পতিবার আসবেন। অনর্থক সময় নষ্ট করবনা আমি, বৃহস্পতিবারই আমার ছুটীর দিন।

—আচ্ছা, আমারও তাই সুবিধে হবে। সাম্‌নের বৃহস্পতিবার তাহ'লে।

—এখানেই খাবেন সেদিন, বুঝলেন।

—সে কথা ঠিক বলতে পারছিনা।

—একথা বলছি আমি, তার কারণ খেতে খেতেই লোকে কথাবার্ত্তা ভাল বলতে পারে; সময়ও থাকে যথেষ্ট।

আচ্ছা, তাই হবে। বারটা তাহ'লে।

সিজার চলে গেল। যাবার আগে এমিলকে আর একবার চুম্বন করলে, রমণীর হাত ধরে বিদায় সম্ভাষণ জানালে।

সপ্তাহটা কত দীর্ঘই না মনে হ'ল সিজারের কাছে। আগে একা কোনদিন থাকেনি সে, নিঃসঙ্গ জীবন তার দুঃসহ মনে হ'ল। এতদিন পর্য্যন্ত পিতার পাশেই ছিল সে তারই ছায়ার মত, তারই সঙ্গে সঙ্গে যেত মাঠে, দেখত সে পিতার কথামত সমস্ত কাজ হচ্ছে কিনা। একটু ছাড়াছাড়ি হ'লেই দুপুরে খাবার সময়ে আবার একত্র হ'ত দুজনে। অপরাহ্নে মুখোমুখী ব'সে দুজনে ধূমপান করত, কত কথা হ'ত তাদের ঘোড়া সম্বন্ধে, গরু সম্বন্ধে, মেষ সম্বন্ধে। প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে তাদের পরস্পর সম্ভাষণ ছিল নিবিড় পারিবারিক সৌহার্দ্দেরই নিদর্শন।

সিজার আজ একা। যন্ত্র চালিতের ন্যায় সে তার শরৎকালীন কাজে যায় গোলাবাড়ীতে, প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হয় তার অই সমতলভূমির ওধারে নীচ থেকে হয়ত পিতার দীর্ঘ দেহ উঠে আসতে দেখা যাবে। সময় কাটাতে সে প্রতিবেশীর বাড়ীতে যায়, দুর্ঘটনার কথা আজও যারা শোনেনি তাদের কাছে গল্প করে, কারও কাছে পুনরাবৃত্তিও করে হয়ত। কাজ ফুরিয়ে যায়, চিন্তা মন্দীভূত হয়ে আসে, রাস্তার পাশে বসে নিজেকে নিজে সে জিজ্ঞাসা করে—এই কি চলবে সমস্ত জীবন ধরে?

কখনো কখনো মিস দোন্তার কথা তার মনে হয়। সিজারের ভাল লেগেছিল তাকে। পিতা বলেছিলেন রমণী ভদ্র, সম্ভ্রান্ত এবং নম্র, তারও তাই মনে হয়েছে। হাঁ, সত্যি বড় ভাল সে। না, সে তাকে ঠকাবেনা, বছর বছর তাকে দুই হাজার ফ্রাঙ্ক দিবে, টাকাটা ঐ শিশুর নামেই থাকবে। ভেবে মনে মনে একটু আনন্দ হ'ল তার পরের

বৃহস্পতিবার সে সেখানে যাচ্ছে, সমস্ত ব্যবস্থা করে আসবে। তারপরেই মনে হ'ল ক্ষুদ্র শিশুর কথা, পাঁচ বছরের ছেলে—তারই পিতার সন্তান—চিন্তা করে মনে একটু বিরক্ত হ'ল তার, ক্লান্তি এল মনে, তবুও কেমন একটা আনন্দও হ'ল। মনে হ'ল এই শিশু তারই পরিবারের অঙ্গ, এই ছটো নাম সে নিতে পারে, নাও নিতে পারে, এ পরিবারকে সে গ্রহণ করতে পারে, ছেড়ে দিতেও পারে, কিন্তু পিতার স্মৃতিকে সে ভুলতে পারবেনা কখনই।

বৃহস্পতিবার ভোরে গ্রেইনড্ বক্সের পিঠে চড়ে রোয়েনের পথে যাচ্ছিল সে, মনে হ'ল তার মন এখন শান্ত। পিতার মৃত্যুর পরে এত শান্ত নিজেকে কখনো মনে হয় নি তার।

দোস্থার কক্ষে প্রবেশ করে দেখল, টেবিলটা ঠিক আগের দিনের মতই সাজান—একটু তফাৎ রুটির উপরটা আজ আর তুলে নেওয়া হয় নি। রমণীকে সে সম্ভাষণ জানালে, এমিলের উত্তর গণ্ডে চুম্বন করল, তারপরে বসে পড়ল অনেকটা যেন নিজের বাড়ীর মতই। তার মনে হ'ল মিস দোস্থা যেন আগের চেয়ে একটু দুর্ব্বল এবং কৃশ হয়ে পড়েছে। বোধ হয় খুবই কেঁদেছে সে। রমণী আজ একটু গম্ভীরভাবে বসেছিল যেন দুর্ভাগ্যের প্রথম আঘাতে আগের দিন যা বুঝতে পারেনি আজ তা বুঝছে। আজ যেন তার দিকে দৃষ্টি একটু বেশী, যেন তারই দয়ার প্রতিদান এ। অনেকক্ষণ ধরে খাবার টেবিলে বসেছিল তারা, বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা চলল আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে। অত অর্থের প্রয়োজন নেই তার। কি করবে সে এত দিয়ে? নিজের জন্য যথেষ্টই সে উপার্জ্জন করেছে কিন্তু সে চায় এমিল বড় হ'য়ে যেন কিছু অর্থ হাতে পায় ওর। কিন্তু সিজার তার সংকল্পে দৃঢ়, আরও হাজার ফ্রাঙ্ক দিল সে মৃতের অন্তিম কার্য্য সমাধা করতে।

কাফি খাওয়া শেষ হ'ল। রমণী তাকে জিজ্ঞাসা করল—ধূমপান করেন কি ?

—হাঁ, করি। আমার পাইপ সঙ্গেই আছে।

এই বলে সে পকেটে হাত দিল। কিন্তু হায়! ভুলে গেছে সে! পাইপ না পেয়ে সিজার একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। বৃদ্ধ হটোর একটা পাইপ দেরাজের মধ্যে রাখা ছিল। রমণী তখন সেইটে এনে তাকে দিল। সিজার হাতে তুলে নিল সেটাকে, চিনতে পারলে, একবার গন্ধ নিলে তার, আবেগভরে সমস্ত গুণাবলী বললে, তারপরে তামাক ভরে জ্বালালে সেটাকে। এমিলকে এনে হাটুর উপর বসিয়ে ঘোড়ায় চড়ালে। রমণী ততক্ষণে টেবিল ক্লথটা সরিয়ে ফেলে ময়লা বাসনগুলি সাইডবোর্ডে রাশ করে রাখছিল। সিজার চলে গেলেই সেগুলি সে ধুয়ে ফেলবে।

প্রায় তিনটার সময়ে সিজার দুঃখের সঙ্গে উঠে পড়ল। যেতে হবে এবার তাকে কিন্তু এটা মোটেই ভাল লাগছিল না তার।

—আচ্ছা মিস দোন্তা, বিদায় এবারে! বেশ লাগল কিন্তু আপনাকে দেখে।

—রমণী তার সামনেই দাঁড়িয়েছিল, চোখে মুখে একটা সলজ্জভাব—একটু অভিভূত। সিজারের দিকে চেয়ে ছিল সে, বোধ হয় বৃদ্ধ হটোর কথাই মনে পড়ছিল তার। সিজারকে সে জিজ্ঞাসা করল—"আবার কি আমাদের দেখা হবেনা ?"

সে সংক্ষেপে উত্তর করল—কেন হবেনা? যদি ভাল লাগে আপনার ?

—সত্যি বলছি, মঁসিয়ে সিজার। আসছে বৃহস্পতিবার কি আপনার সুবিধে হবে ?

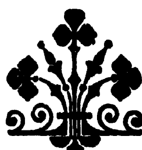
—আচ্ছা তাই হবে।

আপনার খাওয়া দাওয়া কিন্তু এখানেই হবে, বুঝলেন ?

—আচ্ছা, আপনি দয়া করে আমাকে নিমন্ত্রণ করলে তা অস্বীকার করা কি আমার পক্ষে সম্ভব ?

—বুঝেছি আমি। তাহ'লে আসছে বৃহস্পতিবার বারটায়। ঠিক আজকের মতোই।

—আচ্ছা, বৃহস্পতিবার বারটায়—ভুল হবেনা আমার।



মুখোস

সেদিন সন্ধ্যায় মণ্টমার্টার উদ্যানে মুখোস নৃত্য। আলোক সজ্জিত রাস্তা দিয়ে জনস্রোত চলেছে হলঘরের দিকে। অরকেষ্ট্রা বাজছে, ঝড়ের মতই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সে শব্দ, পথঘাট ঘরবাড়ী কাঁপিয়ে তুলে। মানুষের অন্তরের সুপ্ত উন্মাদনাকে যেন জাগিয়ে তুলছিল।

প্যারীর সর্ব্বত্র থেকে এসেছে উৎসাহীর দল। ভালবাসে শব্দ মুখর আনন্দের গভীর উন্মত্ততা, তাই সবাই এসে ভিড় করেছে এখানে। কেরাণীর দল এসেছে সারাদিন আফিসের খাটুনী খেটে। দলে দলে মেয়েরা এসেছে নানারকম সাজগোজ করে। কতরকমের পোষাক পরিচ্ছদ, কতরকম বস্ত্রের বাহার তাদের। ধনী যারা সর্ব্বাঙ্গ সোনারূপা হীরা দিয়ে ঢেকেছেন। দরিদ্র ষোড়শীরা ও আছেন এখানে। আনন্দ তাদের ও আছে, উৎসবে তারা ও যোগ দিতে চান। তাদের ও আকাঙ্ক্ষা—একদিন মনোমত এক পুরুষ এসে দাঁড়াবে তার কাছে, তারই কণ্ঠ সংলগ্ন হবে সে, আপন ইচ্ছামত অর্থব্যয় করবে সেদিন সে। চারদিকে জাকজমক, পোষাক পরিচ্ছদের ঘটা, উন্মত্ত জনতার আনন্দকে যেন ছড়িয়ে দিয়েছিল সর্ব্বত্র। মুখোসধারীরা বসে আছেন, এ উৎসবে আজ তাদেরই নৃত্য। জনসমুদ্রের উৎসুক নেত্র তাদেরই দিকে চেয়ে আছে। কোয়াড্রিল নৃত্য আরম্ভ হ'ল—চার নৃত্যকারীকে ঘিরে রয়েছে লোকগুলি যেন এক চলনশীল উপবন। সর্পগতিতে একবার সাম্‌নে চলছে তারা, আবার পিছনে, নৃত্যকারীদের অনুসরণ করছে এরা। নৃত্যকারীদের দুজন রমণী, মনে হচ্ছে পাগুলি তাদের রবার স্প্রিং দিয়ে দেহের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে কেউ, বিস্ময়কর গতিভঙ্গী তাদের সে পায়ের।

আর সঙ্গীর্য় তাদের! লম্ফে ঝম্ফে চারিদিক কাঁপিয়ে তুলছে যেন! হাতগুলি তাদের শূন্যের উপরই নাচছে। দেখে মনে হয় মুখোসের মধ্যে নিশ্বাস তাদের হাঁপিয়ে উঠেছে।

নৃত্যকারীদের একজন অনুপস্থিত আর একজনের বদলে নাচছিল। কিন্তু পা দুটী সঙ্গিনীর সঙ্গে সমানতালে চলতে পারছিলনা যেন। তার অদ্ভুত পদবিক্ষেপ সমবেত জনতার হাসি ও আনন্দের কারণ হয়েছিল।

দেহ তার কৃশ; পরিচ্ছদ দেখে তাকে বিলাসী বলেই মনে হয়। মুখে তার কোমল মুখোস, তার সঙ্গে সুন্দর বাঁকা বাঁকা গোঁপ, কৃত্রিম চুলগুলি উড়ছিল পিছনের দিকে। দেখে মনে হচ্ছিল কোন মোমের পুতুল নাচছে, কষ্টলব্ধ অদ্ভুত সে নৃত্য হাসির উদ্রেক করছিল সবার। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল সঙ্গীদের অনুসরণ করছে সে, কিন্তু পা যেন তার আর চলছেনা। চারিদিকে বিদ্রূপের প্রশংসাধ্বনি তাকে উৎসাহিত করছিল, উন্মত্ত আবেগে নাচছিল সে অধিকতর উৎসাহ ভরে। কিন্তু দুর্ব্বল পা দুটীর আর সে আবেগ ধরে রাখবার মত ক্ষমতা ছিলনা, দেহ তার হুমড়ি খেয়ে পড়ল গিয়ে জনতার মাঝখানে।

কতকগুলি লোক তখনই তাকে তুলে ধরল, ডাক্তার ডাকা হ'ল। কিন্তু জনতার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। সুগঠিত দেহ এক যুবক, সান্ধ্য পরিচ্ছদ পরিহিত। বিনীতভাবে বললেন— মেডিকেল কলেজের একজন প্রোফেসর আমি। জনতা দুইদিকে সরে গেল। নাচঘরে কতকগুলি চেয়ার একত্র করে তারই উপর অচেতন দেহটাকে ইতিমধ্যেই রেখে দেওয়া হয়েছিল। ডাক্তার প্রবেশ করলেন সেখানে। তাড়াতাড়ি মুখোসটা খুলে ফেলতে গেলেন কিন্তু আশ্চর্য্য হলেন দেখে অদ্ভুতভাবে মাথায় জড়ান তার দিয়ে বাঁধা। ঘাড় পর্য্যন্ত

কৃত্রিম চামড়া দিয়ে ঢাকা, শার্টের কলারের সঙ্গে তা আবার জুড়ে দেওয়া হয়েছে এককরে। কাঁচি দিয়ে সমস্ত কেটে ফেলা হল। কিন্তু ভিতরে এ কি! শুষ্ক কৃশ দুর্ব্বল এক বৃদ্ধের মাথা এযে। এই কৃত্রিম যুবকনৃত্যকারীকে দেখে সবার বিস্ময়ের সীমা ছিলনা। এ তারা ভাবতেই পারেনি। একটা লোক হাসলনা, একটি কথা কার ও মুখ থেকে উচ্চারিত হ'লনা।

চেয়ারের উপর অর্দ্ধাবৃত দেহটা—মলিন মুখ, সেইদিকে দেখছিল সবাই। দুই চক্ষু মুদ্রিত, শ্বেত শ্মশ্রুতে সমস্ত মুখখানা আবৃত, সুদীর্ঘ চুল—কতকগুলি কপোল থেকে মুখের উপর এসে পড়েছে।

বহুক্ষণ অচেতন থেকে লোকটার জ্ঞান হ'ল। কিন্তু বড় দুর্ব্বল সে, অসুস্থতা তার তখনও কাটেনি। ডাক্তারের আশঙ্কা ছিল আবার হয়ত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় থাকেন আপনি ?

একবার কি স্মরণ করবার চেষ্টা করলে, তারপরে কি উচ্চারণ করলে কেউ বুঝলনা। তারপরে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে সে যা বললে তাতে বুঝা গেল লোকটার মাথা ঠিক নেই, সম্পূর্ণ জ্ঞান তখনও ফিরে আসেনি। ডাক্তার বললেন—আমি আপনাকে নিজেই বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আসব চলুন।

এই অদ্ভুত নৃত্যকারীকে জানবার ঔৎসুক্য ডাক্তারকে পেয়ে বসল। একটা গাড়ী ডেকে লোকটাকে তুলে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায় মন্টমার্টারের ওধারে। খোলা হাওয়ায় লোকটার জ্ঞান ফিরে এল, একটা বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী দাঁড়াল তারই কথামত। বেশ বড় উচু বাড়ী কিন্তু তার বর্ত্তমান দারিদ্র দশা নৈশ অন্ধকার ভেদ করেও বেরিয়ে আসছে যেন। একটা ঘুরান সিঁড়ি ধরে দুজনে উপরে উঠল। ডাক্তার এক

হাতে রেলিং এবং অন্য হাতে লোকটাকে ধরেছিলেন। চারতলায় এসে তারা থামল।

একটা দরজায় আঘাত করলে এক বৃদ্ধা দ্বার খুলে দিলে। বৃদ্ধার চেহারা বেশ সাদাসিদে। সাদা নাইটক্যাপে মাথাটা ঢাকা, মুখখানা ঢাকা তবুও মনে হয় রমণী বেশ বুদ্ধিমতী। সে মুখে সততা, পরিশ্রম এবং বিশ্বস্ততার সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠেছিল।

উচ্চৈস্বরে বলে উঠল সে-কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

ডাক্তার তাকে সমস্ত ব্যাপার অতি সংক্ষেপে অল্প কথায় বললেন। রমণী সমস্ত কথা অতি শান্ত নীরব ভাবেই শুনল। মুখে কোন উদ্বেগের চিহ্ন লক্ষিত হ'লনা। তার কাছেই ডাক্তার শুনলেন—এ ব্যাপার এই নূতন ঘটেনি, আর অনেকবার এমন ঘটেছে এর আগে। রমণী তাঁকে বললে—এখন একে একবার বিছানায় শুয়ে দিতে হবে, আর কিছু নয়। একটু ঘুমুক, তাহ'লে কাল সকালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার বললেন—কিন্তু এখনও কথা বলতে পারছেন না যে—

—ও! সেজন্য ভাববেন না আপনি। একটু মদ দিলেই হবে, আর কিছু প্রয়োজন হবে না। দুপুরে খায়নি কিছু—সন্ধ্যায় নাচবে, ক্ষিপ্র-গতিতে সহজভাবে চলতে হবেত! তার তালে নাচতে না পারলে লোকে হাসবে যে! বুঝলেন—মদ উত্তেজনা এনে শরীরে সাময়িক শক্তি দিতে পারে কিন্তু কোন কিছু ভাববার বা কথা বলবার শক্তি নষ্ট করে দেয় এ। আজ কাল ও এত বৃদ্ধ হয়েছে যে এরকম করে নাচা তার চলেনা। সত্যি কথা বলতে—তার মত বুদ্ধিশূন্য, কাণ্ডজ্ঞান রহিত হ'লেই লোক পাগল হয়।

বিস্মিত হয়ে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—

—কিন্তু তবুও এ বয়সে তিনি নাচতে যান কেন?

রমণী কি উত্তর দিতে গিয়ে একবার থামল। ধীরে ধীরে সমস্ত শরীর তার লাল হয়ে উঠল, অন্তরের বিরাট আগ্নেয়গিরি যেন ফেটে পড়বে এখনি। চীৎকার করে সে বলতে লাগল—

—কেন? জিজ্ঞাসা করছেন শুনবেন? লোকে মুখোসের মধ্যে তাকে যুবক মনে করবে বলে, যুবতীরা এখনও ভাববে সে এক বিলাসী যুবক—কানে তারা তার কতগুলি কদর্য্য ভাষা ঢেলে দিবে এই তার প্রলোভন। এই লোলচর্ম্ম কতকগুলি তরুণ দেহ চর্ম্মের স্পর্শ লাভ করবে, তরুণী দেহের সুগন্ধ, পাউডার, তাদের প্রসাধনের অংশ একমাত্র সে এইভাবেই সে এখনও পেতে পারে। বেশ ভাল ব্যবসা, বুঝলেন? কি জীবনই না আমি এই চল্লিশ বছর ধরে যাপন করে আসছি। কিন্তু তাকে ত এখনই বিছানায় শুইয়ে দেওয়া দরকার। আপনি দয়া করে একটু সাহায্য করবেন আমাকে? এমন অবস্থায় তাকে নিয়ে একা আমি কোনদিনই পারিনা।

বৃদ্ধ বিছানার উপর বসেছিল, চোখে মুখে তার মাতালের ভাব। সাদা সাদা লম্বা চুল গুলি মুখের উপর এসে পড়েছিল। রমনী সকরুণ অথচ বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টিতে একবার সেইদিকে দেখলে। তারপরে আবার বলতে লাগল—

—দেখুন ত একবার! একবার মনে করুন তার বয়স, আর দেখুন এই মাথাটা। কি সুন্দর নয়? তবুও লুকিয়ে যেতে হবে তাকে, লোককে বোঝাতে হবে সে যুবক। কি লজ্জার কথা! বাস্তবিক বলছি, কি সুন্দর? দেখেছেন এমন একটা মাথা আপনি? আচ্ছা দাঁড়ান একটু, ওকে শুইয়ে দেবার আগে আপনাকে দেখিয়ে নিই।

কাছেই টেবিলের উপর ছিল একপাত্র জল, সাবান, চিরুণী এবং ব্রাস। ব্রাসটা হাতে নিয়ে বিছানার কাছে ফিরে এল সে, বৃদ্ধ মাতালের

চুলগুলি সুবিন্যস্ত করে পিছনে টেনে দিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এক অপরূপ বার্দ্ধক্যের সৌন্দর্য্য সে মুখে ফুটে উঠল—যেন শিল্পীর মডেল সে। লম্বা লম্বা চুলের গোছাগুলি ঘাড়ের উপর এসে পড়েছিল। রমণী কতকটা পিছিয়ে এল, দূর থেকে ঝাড়টা আর একবার দেখবে বলে। তারপরে সেখান থেকেই বললে—

—এই দেখুন এবার! এই তার বয়স, কেমন সুন্দর নয় কি?

ডাক্তার মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন, রমণীর এ সমস্ত ভাল লাগছিল তার। রমণী আবার বলতে আরম্ভ করল—

—ওর যখন পঁচিশ বছর বয়স, যদি দেখতেন ওঁকে! কিন্তু এখন ওকে আর দেরী না করে আগে শুইয়ে দেওয়া দরকার, নয়ত মদ আরও অসুস্থ করে ফেলবে। আচ্ছা, আপনি হাতের আস্তিনটা একটু তুলে ধরবেন কি? আর একটু উপরে, হাঁ, ঠিক হয়েছে। এবারে পায়-জামাটা—আচ্ছা দাঁড়ান একটু, আমি তার জুতাটা আগে খুলে নিই। আচ্ছা, এখন একবার ধরুন ওকে শুইয়ে দেওয়া যাক।

বিছানায় গা দিয়েই বৃদ্ধ চোখ বুজল, একবার খুলল সে চোখ আবার তখনি বন্ধ করিল। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করছিলেন। দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করলেন।

আপনাকে সমস্ত জানিয়ে শুনিয়েই সে যায় তবে? আর সব সময়েই কি যুবক সাজতে চায়?

হাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি। সমস্ত ব'লে কয়েই ও যায়, এবং প্রতিবারই এমনি অবস্থায় ভোরের দিকে ফিরে আসে। বুঝেছেন, আমি জানি একমাত্র দুঃখই তাকে এমনি ক'রে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়, এমনি ক'রে মুখে মুখোস পরায়। হাঁ, তার মুখ সে আজ আর আগের সেই লোক নাই, আজ আর তার সেই জয়ের আশা নেই।

বৃদ্ধ ঘুমোচ্ছিল, তার নাক ডাকছিল। করুণা ভরা দৃষ্টি দিয়ে রমণী একবার সেইদিকে চেয়ে দেখলে। তারপরেই বলতে লাগল—

—কত মন যে জয় করেছে ও! শুনলে লোকে বিশ্বাস করবে না। জগতের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনীষি, সব চেয়ে বড় সেনাপতিও এতগুলি চিত্ত জয় করতে পারেন নি।

—সত্যি? কি কাজ করেন তিনি?

—হাঁ, হয়ত বিস্মিত হবেন আপনি, কারণ তার সুসময়ে আপনি তাকে দেখেননি। আমার সঙ্গে তার দেখা হয় সেও এমনি একটা বল নাচে, এটা তার চিরদিনের অভ্যাস। দেখেই আমি আকৃষ্ট হলাম, বড়শি দেখে যেমন মাছ আকৃষ্ট হয়ে থাকে। আ! কি সুন্দরই না সে ছিল! কোকড়া কোকড়া চুল, বড় বড় কালো দুটো চোখ। সত্যি বলছি আপনাকে। কি সুন্দরই না তাকে দেখাত! সেই সন্ধ্যায়ই বল থেকে সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেল। তারপরে কখনো ছাড়িনি তাকে, বুঝেছেন, একদিনের জন্যও না। আমার প্রতি তার ব্যবহার যাই হউক না কেন তার সঙ্গ আমি ত্যাগ করিনি কখনো। এক এক সময়ে আমার অসহ্য মনে হ'ত, কিন্তু কি করবো, বলুনত?

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাদের বিবাহ হয়েছে কি?

রমণী সহজভাবেই উত্তর করলে—হাঁ, বিয়ে হয়েছে, নইলে আর সবার মত আমাকেও সে একদিন ছেড়েই যেত। আমি তার স্ত্রী, তার ক্রীতদাসী, সব কিছু আমি তার, সে যা চায় সবই। কত কাঁদিয়েচে সে আমাকে, কিন্তু একদিনের জন্য দেখাইনি তাকে সে চোখের জল। তার সব বিজয় কাহিনী এসে সে আমার কাছেই বলত। একবার বুঝতনা কি নিষ্ঠুর আঘাত করছে সে আমাকে।

—কি করতেন তিনি?

—ও! আপনার সে প্রশ্ন আমি ভুলেই গেছলাম। মার্টেলের ওখানে সে ফোরম্যানের কাজ করত, এমন ফোরম্যান তারা দেখেনি কখনো। আর্টিষ্ট সে, ঘণ্টায় গড়ে তার আয় হ'ত দশ ফ্রাঙ্কের মতো।

—মার্টেল! কে মার্টেল?

—হেয়ার ড্রেসার মার্টেল, অপেরার বিখ্যাত হেয়ার ড্রেসার। সমস্ত অভিনেত্রীরাই তার ওখানে আসত, ওখানে চুল ঠিক করে নিত সবাই। আ! সত্যি বলছি, সব মেয়েরাই এক, সবই একরকম! একজন পুরুষকে যখন তাদের ভালো লাগে তখনই আপনাকে তার কাছে সমর্পণ করে। এত সহজ—কিন্তু শুনতে আঘাত লাগত আমার। সবই এসে সে আমার কাছে বলত—কিছুই গোপন রাখতে পারতনা—এ তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পুরুষেরা এত ভালবাসে এ জিনিসটা—কোন কিছু করার চেয়ে যেন তা বলে বেড়ানই তাদের বেশী আনন্দ।

রাত্রে দেখতাম সে ফিরে এসেছে, চেহারা মলিন হয়ে গেছে, কিন্তু সমস্ত চোখে মুখে যেন একটা তৃপ্তির হাসি, চোখদুটী যেন আরও উজ্জল, আরও তীক্ষ্ণ। নিজে বলতাম—এবারে আর একটী, নিশ্চয়ই আর একটী ধরা পড়েছে আবার। দুর্দমনীয় ইচ্ছা হ'ত ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখি কিন্তু পরক্ষণেই ইচ্ছা হ'ত, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়েই চাইতাম আমি—যেন না জানি কিছু এর, যেন না বলে সে কিছু। বলতে আরম্ভ করলে মনে হ'ত যদি পারতাম তাকে থামিয়ে দিতাম। পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকতাম আমরা দুজনে।

কিন্তু জানতাম কিছুতেই স্থির থাকতে পারবেনা সে, আসল কথায় সে ফিরে আসবেই। তার সমস্ত হাবভাব ব্যবহার থেকে বুঝতাম আমি এ। মনে হ'ত সমস্ত চেহারাই যেন তার হেসে বলছে—মাডোলিন, আজ আবার এক নূতন জয় করে এসেছি। জান

করতাম তার কিছুই যেন লক্ষ্য করিনি আমি, তার সম্বন্ধে যেন ভাবিনি কিছুই।

কিন্তু মনে আঘাত লাগত, মনেহয়ত স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ যেন পাথর দিয়ে কেউ গুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কিছুই বুঝত না সে, কিছুই জানত না। তার নিজের কথা কারও কাছে তার বলতেই হবে, এ নিয়ে গর্ব্ব তাকে করতেই হবে, জানাতে হবে কি ভাবে চায় তাকে মেয়েরা সবাই। আর আমিই ছিলাম, একমাত্র যার কাছে সবই বলতে পারে সে। তাই সবই শুনতে হ'ত আমাকে, পান করতে হ'ত ঠিক বিষের মতই। সুপ খেতে খেতে বলে উঠত সে—ম্যাডোলিন, এবারে আর একটা। আমি ভাবতাম—সর্ব্বনাশ! এই আরম্ভ হ'ল আবার! হায় ভগবান! কি যে লোক! কেন আমার দেখা হয়েছিল একদিন এর সঙ্গে?

সে বলে যেত—আজ আর একটা। আর বেশ দেখতে। প্রায়ই যাদের কথা বলত সে সবাই তাদের জানে। আমার কাছে সে তাদের নাম বলত, তাদের বেশ ভূষা অলঙ্কারের কথা বলত। সব—সবই বলত সে আমাকে। হৃদয় আমার ভেঙ্গে যেত এই দীর্ঘ বর্ণনা শুনে। কিন্তু আমার কথা কিছুই ভাবতনা সে, নিজের কথায় নিজেই মত্ত থাকত। হাসির ভান করতাম যেন সে রাগ না করে। সব কথাই তার সত্য না হতে পারে। নিজের গৌরব বাড়াতে ভালবাসত সে। তবুও কিছু ত সত্য! সে রাত্রে তাকে খুবই ক্লান্ত লাগত, খেয়েই শুয়ে পড়ত। রাত এগারটায় খাওয়া হ'ত আমাদের, কারণ এর আগে কাজ থেকে ফিরত না সে।

বিজয় কাহিনী শেষ হ'ত, একটা সিগারেট ধরিয়ে সমস্ত ঘরটা পায়চারি করত সে। কি সুন্দর ছিল সে—কোঁকড়ান দাড়ি গোঁপ—কোঁকড়ান চুল। ভাবতাম আমি—সমস্তই সত্য বলছে সে। এর জন্তই ত আমার এ অবস্থা, তবে অন্তের হবেনা কেন? একবার ইচ্ছা

হ'ত প্রাণ খুলে কাঁদি, বুক ফেটে চীৎকার করি, ছুটে পালিয়ে যাই কোথাও, লাফিয়ে পড়ি জানালা দিয়ে নীচে।

তার প্রতি দ্বেষ নেই আমার। জানতনা সে কি আঘাত আমাকে করছে। না, কি করে জানবে সে? এ নিয়ে গর্ব্ব করতে ভালবাসত সে, ময়ূর যেমন ভালবাসে পুচ্ছ দেখিয়ে বেড়াতে। ঘুরে ফিরে সে বলতে চাইত সবাই চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে, সব মেয়েরাই তাকে চায়।

কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে সেদিন আর নেই তার। প্রথম যেদিন মাথায় তার সাদা চুল গাছি আবিষ্কার করলাম কি আঘাত পেলাম প্রথমে। কিন্তু তার পরেই এক অপূর্ব্ব আনন্দে আমার সমস্ত অন্তর ভরে গেল। এক সর্ব্বনাশা আনন্দ। কিন্তু কি বিরাট, কি বিপুল। নিজে নিজে বললাম এই বার শেষ। মনে হল কারাগার ভেঙ্গে মুক্তি এসেছে আমার জন্য। এবার আমি তাকে পাব, সম্পূর্ণ আমার করে একান্ত করে পাব আমি। সবার চাওয়া ফুরিয়েছে আর কেউ চাবে না তাকে এবার।

খুব ভোরে এক দিন বিছানার উপরে। সে তখন ও ঘুমুচ্ছে। বুকের উপর ঝুকে পড় একটী চুম্বনে তাকে তুলতে যাচ্ছি, লক্ষ্য পড়ল কপালের উপর কোঁকড়ান চুলের মধ্যে কি একটা সাদা রূপার সূতার মত জ্বলছে। কি আমার বিস্ময়! এ সম্ভব হতে পারে একদিনও মনে করিনি আমি। একবার মনে হ'ল আস্তে আস্তে টেনে তুলে ফেলি, সে যেন কিছু টের না পায়। কিন্তু ভাল করে দেখতে গিয়ে দেখলাম আরও একটা। বুকের মধ্যে দ্রুত স্পন্দন আরম্ভ হ'ল, ঘামিয়ে উঠলাম—কিন্তু মনে আমার ছিল এক অপূর্ব্ব তৃপ্তি।

জানি এ আমার হীনতার পরিচয় কিন্তু সেদিন ঘুম থেকে তুলিনি আমি তাকে। মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ নিয়ে ঘরের কাজে লেগে গেলাম। যখন নিজে নিজে সে চোখ মেলল, আমি তাকে বললাম—

—জানো, তুমি যখন ঘুমিয়ে ছিলে আমি কি আবিষ্কার করেছি ?

—না।

—তোমার মাথার পাকাচুল দেখেছি আমি।

সে চমকে উঠল। রেগে বললে—না, এ হতেই পারেনা।

—হাঁ, ঠিকই বলছি আমি। তোমার বা দিকে কপালের উপরে চারটী পাবে।

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল সে, ছুটে গেল আর্শির কাছে। প্রথমে সে দেখতে পেলেনা। আমি দেখিয়ে দিলাম প্রথমটী একেবারে নীচুতে, কোঁকড়ান ছোট একগাছি চুল। বললাম তাকে—আশ্চর্য্যের ব্যাপার কি আছে? যে জীবন চলছে তোমার—আর দুবছরেই সব শেষ হবে।

—হাঁ, সত্যি বলছি আমি। দুই বছরের মধ্যেই এমন হ'ল যে কে চিনবে তাকে? কত তাড়াতাড়ি মানুষের পরিবর্ত্তন হ'তে পারে! কিন্তু তবুও কি সুন্দর সে! কিন্তু পুরাতন সজীবতা আর নেই, মেয়েরা আর মুগ্ধ হয়না তাকে দেখে। আ! কেমন কেটেছে তখন দিনগুলি আমার। কি ভাল ব্যবহার করত আমার প্রতি! কাজ সে ছেড়ে দিল, আরম্ভ করল টুপীর ব্যবসায়। কিন্তু সেখানেই শেষ হ'ল তার সমস্ত অর্থ। তারপরে একবার ব্যর্থ চেষ্টা করলে অভিনেতা সাজবার, শেষে আরম্ভ হ'ল এই বলনাচে যাওয়া। ভাগ্যক্রমে বুদ্ধি করে সামান্য কিছু অর্থ সে রক্ষা করেছিল তারই উপরে আজ আমাদের খাওয়া পরা চলছে অর্থ বেশী নয় তবু আজ এ আমাদের যথেষ্ট। কিন্তু এক সময়ে কি তার না ছিল!

দেখেছেন ত কি করছে সে এখন? এ অভ্যাস আজ পাগলের মত করেছে তাকে। আজ তাকে যুবা হ'তে হবে, তরুণীদের সঙ্গে

একসঙ্গে নাচতে হবে, তাদের স্পর্শ পেতে হবে, তাদের দেহের গন্ধে আজও তাকে পুলকিত হতে হবে। হতভাগ্য বৃদ্ধ সে।

গভীর ঘুমে বৃদ্ধের নাক ডাকছিল, রমণী সেই দিকে একবার চেয়ে দেখল। তারপর ধীরে ধীরে পা ফেলে সেইদিকে অগ্রসর হ'ল, মুখখানা সযত্নে ধরে মাথার উপরে একটা চুম্বন করলে।

ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন বিদায় নেবার জন্য। কি বলবেন তিনি এই অদ্ভুত দম্পতিকে? যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছেন দেখে রমণী তাকে বল্লে—

—আপনার ঠিকানাটা রেখে যাবেন কি? রাত্রে দরকার হ'লে আপনাকে আমি গিয়ে ডেকে আনতে পারি।



ভগ্ন জাহাজ

কাল গেছে ৩১শে ডিসেম্বর।

পুরান বন্ধু জর্জ্জ গেরিনের সঙ্গে একত্র প্রাতরাশ সমাপ্ত করে এই মাত্র উঠেছি। চাকর এসে তার হাতে এক খানা চিঠি দিল, চিঠির উপরের ষ্ট্যাম্প গুলি বিদেশী।

জর্জ্জ আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—

—চিঠিটা দেখে নিতে পারি কি?

—নিশ্চয়ই।

চিঠিটা সে পড়তে আরম্ভ করলে। বড় বড় অক্ষরে ইংরেজী হাতের লেখা। খুব ধীরে ধীরে গভীর মনোযোগের সহিত চিঠিটা শেষ করলে সে। মনে হ'ল এর মর্ম্ম তার হৃদয় স্পর্শ করেছে।

পড়া শেষ করে চিঠিটা শেল্‌ফের উপর রেখে দিলে, তারপর ফিরে বলতে লাগল—

এক অদ্ভুত গল্প! মনে হচ্ছে তোমাকে বলিনি এ কথা। আমারই জীবনে এ ঘটেছিল। নববর্ষের প্রথম দিন। প্রায় বিশ বছর আগে। হাঁ, আমার বয়স তখন ত্রিশ বছর আর এই আমার পঞ্চাশ চলেছে।

মেরীটাইম ইনসিওরেন্স কোম্পানীর আমি তখন ইনস্পেক্টার। আর সেই কোম্পানীরই আজ ডিরেক্টার আমি। নববর্ষের প্রথম দিনটা বরাবর আমার প্যারীতেই কাটত। এ দিনটা আমোদ উৎসবে কাটান এক-রকম আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওখানে ডিসেম্বর চিঠি পেলাম ম্যানেজারের কাছ থেকে অনতিবিলম্বে আমাকে রেবীপে যাত্রা করতে হবে। তিন মাস্তুলের একটা ইনশিওর করা জাহাজ চড়ায়

বেঁধেছে সেখানে। তখন প্রাতকাল আটটা। দশটার সময়ে অফিসে গিয়ে সমস্ত দরকারী ব্যাপার জেনে নিলাম। বিকেল বেলা এক্সপ্রেস ধরলাম। পরদিন ৩১শে ডিসেম্বর ল্যা রসেল পৌছুলাম।

রেদ্বীপের জাহাজ ছাড়তে তখনও দুই ঘণ্টা দেরী। ইচ্ছা হ'ল সহরটা ঘুরে একবার দেখে নিই। অদ্ভুত সহর এই লারসেল, রাস্তাগুলি গোলক ধাঁধার মত জড়ান, উঁচু উঁচু ফুটপাথগুলি সুদূর প্রসারিত, মাথার উপরে লতামণ্ডিত মনে হয় সমস্ত গুপ্ত ষড়যন্ত্রের এ আশ্রয় স্থল, একটা রুষ্ট বিষন্নভাব এর বিশেষত্ব।

এই অদ্ভুত রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরে আমি গিয়ে জাহাজে উঠলাম। এই জাহাজেই আমাকে রেদ্বীপে যেতে হবে, জিন গিতো এর নাম। সহজ সফেন নিঃশ্বাস ছেড়ে জাহাজ চলতে আরম্ভ করল, কিছুক্ষণ সোজা চলে দক্ষিণ দিকে মোড় ফিরল।

দিনটা কনকনে ঠাণ্ডা, কুয়াসা পড়ছিল যেন বৃষ্টির মত। এমন দিনে বিমর্ষতা যেন কোথা থেকে আপনিই চলে আসে, মন তার সমস্ত শক্তি, সমস্ত উদ্যম হারিয়ে ফেলে।

অন্ধকার কুয়াসা ভেদ করে জিন গিতোঁ চলেছিল, স্বাভাবিক দোলায় দুলছিল সে, নীচে নিবিড় নীল জলরাশিকে দ্বিধাবিভক্ত করে চলছিল যেন। পশ্চাতে উঠছিল ছোট ছোট ঢেউ, কিছুক্ষণ উথল পাথল করে আবার ঝিমিয়ে পড়ছিল সাগরের বুকে।

জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম। আমাকে যে রিপোর্ট দিতে হবে তারই সংবাদ জেনে নিচ্ছিলাম। তার কাছেই শুনলাম, তিন মাস্তুলের জাহাজ মেরী জোসেফ এক রাত্রের ঝড়ে ডাঙ্গায় এসে উঠেছে—রেদ্বীপের চড়ার উপর।

কোম্পানী জাহাজের মালিকের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছে। তিনি

জানিয়েছেন—জাহাজ এত দূরে গিয়ে পড়েছে যে সেখান থেকে তাকে জলে নামান অসম্ভব। তবুও ভাঙ্গাজাহাজ আমাকে ভাল করেই দেখতে হবে। কোম্পানীর এজেন্ট আমি, কোর্টে পর্য্যন্ত তার স্বার্থ আমাকে যে প্রকারেই হোক্ রক্ষা করতেই হবে—তারই জন্য এ আয়োজন। আমার রিপোর্ট পেলেই ম্যানেজার সমস্ত ব্যবস্থা করবেন।

জিন গিঁতোর কাপ্তেন মেরীজোসেফকে জানে। জাহাজ নিয়ে সে নিজেই গিয়েছিল উদ্ধারের কাজে।

তার কাছেই সমস্ত ইতিহাস আমি শুনলাম। রাত্রের ভীষণ ঝড় ফেনাবর্ত্ত সাগরের মধ্য দিয়ে তাকে ডাঙ্গায় নিয়ে তুলে দিয়েছে। জল নেমে গেছে কিন্তু জাহাজ এখন বালুচরে, শাহারার বুকের মতই ধূধু করছে বালুরাশি।

কথা বলতে বলতে মাথা তুলে চারদিক একবার দেখে নিলাম। মাথার উপরে অসীম আকাশ ক্রমে নীচু হয়ে সাগরের বুকে নেমে এসেছে, বহু দূরে দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করে। আমাদের জাহাজ উপকূল ঘিসে চলছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—

—এই কি রেদ্বীপ?

—হাঁ, এই সেই। ঐ চেয়ে দেখুন।

কাপ্তেন তার ডান হাতখানা প্রসারিত করে আমাকে কি দেখাল। অনন্তপ্রসারী সাগরবক্ষে কিছুই দেখতে পেলাম না আমি। কাপ্তেন আবার বলল—

—কি দেখতে পাচ্ছেন না? অই যে সেই জাহাজ।

—মেরী জেসেফ?

—হাঁ।

—আমি অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম। দুর্লক্ষ্যে একটা কালো

দাগের মত দেখা যাচ্ছিল সাগরের বুকেই। মনে হ'ল দূরত্ব এর তিন মাইলের কম হবেনা।

—আমি বললাম, কিন্তু ওখানে জলত একশ ফ্যাদমের কম হবেনা। জাহাজ চড়ায় আটকেছে না?

—একশ ফ্যাদম! কি বলচেন আপনি! জোয়ারে জল উঠেছে কিন্তু এক ফ্যাদমও হবেনা। এখন নটা চল্লিশ। ডাফন হোটেলে খেয়ে উপকূল ধরে হাটতে থাকুন, তিনটার সময়ে পৌছে যাবেন ওখানে, আপনার পা ভিজবেনা। কিন্তু দেখবেন ত্বঘণ্টা পৌনে ত্ব ঘণ্টার বেশী থাকবেন না ওখানে, বিপদে পড়বেন তাহ'লে। জল আবার বেড়ে যাবে। তাই পাঁচটার আগেই ফিরবেন, সাড়ে সাতটার আগেই জিন গিঁতোতে এসে পৌছবেন তবে। কালকের সন্ধ্যায় আবার লারসেলে ফিরে যাব আমরা।

প্রাতরাশ সমাপ্ত করে ডাঙ্গায় উঠে পড়লাম। সমুদ্রের জল নেমে আসছিল। দৃষ্টির সামনে কালোপাহাড়টা তখনও দেখা যাচ্ছিল জলের উপর ভাসছে। অনন্ত বালুরাশির মধ্যদিয়ে ছিল আমার পথ।

হলুদ রংএর তটভূমি ক্রমাগত পিছনে ফেলে চলছিলাম। পায়ের নীচে বালুরাশি যেন মেদরাশির মতই স্থিতিস্থাপক, পায়ের নীচে ঘেমে উঠেছে যেন। একটু আগেও এখানটা সাগরের জলে ডুবেছিল। জলরেখা এখনও দেখছি কিছুদূরে, দৃষ্টি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে যেন। সাগরের জল এবং উপকূলের সীমারেখা টানবার জো নেই। মনে হচ্ছিল যেন অদ্ভুত ইন্দ্রজাল দেখছি আমার সামনে। এই মাত্র আমার চোখের সামনে ছিল আটলাণ্টিক আর দেখতে দেখতে বালুচরে কোথায় তা মিলিয়ে গেল।

এখন আর ঠাণ্ডা নাই। ভগ্ন জাহাজ ক্রমেই বড় হ'য়ে আসছিল।

সেইদিকেই আমি চেয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল সুদূর বিস্তৃত বালুচরের বুক ফুড়ে এক বিরাট অস্তিত্ব উঠে যেন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রায় একঘণ্টা চলবার পরে আমি জাহাজের কাছে পৌছলাম। ভাঙ্গা জাহাজটা একদিকে একটু কাত হ'য়ে পড়ে আছে, মৃত জন্তুর দেহের মতই হাড়গুলি দেখা যাচ্ছিল যেন। ইতিমধ্যেই বালুরাশি এসে চারদিক থেকে তাকে আক্রমণ করেছে, নড়বার শক্তি তার নষ্ট করে দিয়েছে। অগ্রভাগ উপকূলের অন্তরে প্রবেশ করেছে, আর পশ্চাতের দিকটা উপরে থেকে গভীর আর্ত্তনাদে উর্দ্ধে যেন তার শেষ নিষ্ফল আবেদন জানাচ্ছে, কালো জাহাজের গায়ে সাদাদুটী অক্ষর "মেরী জোসেফ" আঁকা হয়ে আছে।

এইবার মৃত জাহাজের বুকে চড়লাম। ডেকের উপরে উঠে নীচে নামলাম। দিনের আলোতে দেখলাম বড় বড় ফাটল, তক্তাগুলি ভেঙ্গে গেছে।

জাহাজের অবস্থা দেখে নোট করে নিচ্ছিলাম, একটা পিপার উপর বসে ফাটলের আলোতে লিখছিলাম। একটা মর্ম্মভেদী তীব্র শীতলতা, সীমাহীন নীরব নির্জ্জনতার সঙ্গে মিশে আমার দেহকে এক একবার কাঁপিয়ে তুলছিল যেন। এক দুর্জ্জেয় রহস্যময় শব্দ ভেসে আসছিল মাঝে মাঝে এই ধ্বংসস্তুপের অন্তর ভেদ করে। মাঝে মাঝে লেখা বন্ধ করে কান পেতে শুনছিলাম তাই। কত শত সামুদ্রিক জীব এরই মধ্যে এই মৃতদেহের বুকে বাসা বেঁধেছে।

হঠাৎ শুনলাম মনুষ্যকণ্ঠ, আমার অতি নিকটেই। চমকে উঠলাম, ভূত দেখেছি যেন হঠাৎ! মুহূর্ত্তের জন্য মনে হ'ল জলমগ্ন লোকগুলি সাগরগর্ভ থেকে উঠে এসেছে হয়ত। এখনই হয়ত সমস্বরে বলতে আরম্ভ করবে তাদের সকরুণ মৃত্যুর কথা, মর্ম্মভেদী শেষ নিষ্ফল আবেদন,

তাদের জীবনের জন্য তারই কথা বলবে তারা আমার কাছে। তাড়া তাড়ি নীচ থেকে এসে ডেকের উপর দাঁড়ালাম। সেখানে দেখলাম এক ইংরেজ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, সঙ্গে তার তিন কন্যা। তাদের দেখে আমি বিস্মিত হ'লাম কিন্তু আমার হঠাৎ আবির্ভাবে তাদের ভয় আমার বিস্ময়কেও ছাড়িয়ে গেল যেন। সব চেয়ে ছোট বালিকাটী ভয়ে পালিয়ে গেল, অন্য দুটী পিতার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরল। ভদ্রলোক নিজে কি উচ্চারণ করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন কথাই বেরোলনা মুখ থেকে। বুঝলাম অবাক হয়েছে সবাই আমাকে দেখে, এই একান্ত নির্জ্জনতার মধ্যে আমি একবারেই অপ্রত্যাশিত।

কিছুক্ষণ কেটে যেতে ভদ্রলোক ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন—

—আপনি কি এই জাহাজের মালিক ?

—হাঁ।

—এর উপরে আসতে পারি কি ?

—আসুন।

এর পরে ভদ্রলোক ইংরেজী ভাষায় লম্বা এক বক্তৃতা আরম্ভ করলেন কিন্তু কয়েকবার 'Gracious' এই কথাটী ছাড়া একটী কথাও আমার বোধগম্য হ'লনা !

ভদ্রলোক উপরে আসার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কিভাবে উঠবেন ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। আমি হাত ধরে তাকে তুললাম। বালিকা তিনটীকেও তুললাম এমনি করে। ওদের বিস্ময়ের ভাব অনেকটা কেটে গেছে ততক্ষণে। দেখতে তিনজনই সুন্দর, বিশেষ করে সবচেয়ে বড় যেটী। বয়স আঠার বছর হবে—ফুলের মত প্রফুল্ল, ফুলের মত সুন্দর, ফুলেরই মত মনোমুগ্ধকর। এই সীমাহীন দিগন্তের বুকে তাকে দেখে

মনে হবে সমুদ্রের শুভ্র শঙ্খের কথা, উজ্জ্বল মুক্তাপাঁতির কথা, অজানা সাগরের বুকে যারা লুকিয়ে আছে।

পিতার চেয়ে ফরাসী ভাষা সে কিছু ভাল জানে। তাই দ্বিভাষীর কাজ নিলে সে। সেখানে বসে এই ভাঙ্গা জাহাজের সমস্ত ইতিহাস বলতে হ'ল তাদের। তারপরে সবাই নামলাম সেই ধ্বংসের অভ্যন্তরে। দিবাশেষের ক্ষীণ আলোতে সেই অন্ধকার গর্তে নেমে তারা ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল। দেখলাম পিতা ও তিন কন্যা সবার হাতেই ছবি আঁকার খাতা, পরিচ্ছদের ভিতরে কোথায় লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। এর পরে আরম্ভ হ'ল ছবি আঁকার পালা।

এক খণ্ড কড়িকাঠের উপর চারজনেই বসে গেল পাশাপাশি। আটটী হাটুর উপর চার খানি সোনালী খাতার পাতা গুলি ভরে উঠতে লাগলো কালো কালো লাইনে এবং দাগে।

আমি জাহাজের কঙ্কালটাকে পরিদর্শনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম, বড় মেয়েটী তার ছবি আঁকার ফাকে ফাকে কথা বলছিল আমার সঙ্গে।

ইংরেজ জাতির স্বাভাবিক উদ্ধতভাব এদের মধ্যে দেখি নাই। বিশেষতঃ বড় মেয়েটী—কথার ভঙ্গী তার সবাইকে হাসিয়ে দেয়—সহজ সরল সে হাসি। সাগরের মত গভীর নীল চোখদুটী তুলে এক একবার কত কি জিজ্ঞাসা করে, আবার ছবি আঁকে, আবার দেখে নেয় সবাই কি মনে করছে—সবই সুন্দর তার, দেখে দেখে ক্লান্তি হয়নি আমার।

হঠাৎ একবার বলে উঠল সে—কি যেন শব্দ শুনছিনা?

কান পেতে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম। ফাটলের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠলাম। সমুদ্র একেবারে কাছে এসে পড়ছে, এখনই ঘিরে ফেলবে আমাদের।

মুহূর্ত মধ্যে সবাই ডেকের উপর উঠে দাঁড়ালাম। এরই মধ্যে চারদিক জলে ভরে গেছে। উন্মত্তবেগে জলরাশি কূল থেকে কূলের সন্ধানে চলেছে। আমাদের চারদিকে জলের গভীরতা এখনও কয়েক সেণ্টিমিটারের বেশী নয়। কিন্তু উত্তাল জলরাশি এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে এখান থেকে তটরেখা দেখা যায় না।

ইংরেজ ভদ্রলোক লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হলেন। আমি ধরে রাখলাম তাকে। এই অনন্ত জলরাশি পার হওয়া এখন অসম্ভব।

মুহূর্ত্তের জন্য কি ভাবনা হ'ল। ছোট মেয়েটী বললে—

—জাহাজ ধ্বংস আজ আমাদেরই পক্ষে সত্য হ'ল।

আমি হাসতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কোথা থেকে ভয় এসে কণ্ঠরোধ করল আমার। আমি বুঝলাম এ আমার ভীরুতা, এই বানের জলের মতই বিশ্বাসঘাতক সে, এই বানের জলের মতই নীচ এবং ভয়ানক। সেই মুহূর্ত্তেই বুঝলাম কি ভীষণতা ঘিরে রয়েছে আমাদের। একবার মনে হ'ল চীৎকার করে ডাকি—কে আছ? কিন্তু কাকে ডাকব?

ছোট দুই কন্যা পিতাকে জড়িয়ে ধরেছিল, পলকহীন নেত্রে সীমাহীন জলরাশির দিকে চেয়েছিলেন তিনি।

সমুদ্র দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিল, রাত্রিও এগিয়ে আসছিল এদিকে। রাত্রি অন্ধকার—বরফের মতই শীতল।

আমি বললাম—এই ডেকের উপর বসে থাকা ভিন্ন উপায় নেই এখন।

ইংরেজ ভদ্রলোক উত্তর করলেন—হুঁ!

পনের মিনিট, আধঘণ্টা অপেক্ষা করলাম, সময়ের জ্ঞান ছিলনা। সুনিবিড় কালো জলরাশি হামাগুড়ি দিয়ে আসছিল, আমাদের চারদিকে পাক খেয়ে ফিরছিল, উপকূলের সন্ধান না পেয়ে ভাঙ্গা জাহাজের

সঙ্গেই খেলা করছিল যেন। নির্নিমেষ চোখে তাই দেখেছিলাম আমি।

সব চেয়ে ছোট মেয়েটীর শীত লাগছিল, আশ্রয় নিতে আমরা একটু ভিতরে গেলাম। উপরে যাবার দরজার পাশেই বসেছিলাম আমি।

ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এল। পরস্পরের গা ঘিসে ছিলাম সবাই। ইংরেজ বালিকার স্কন্ধদেশ আমারই কাঁধের উপর অনুভব করলাম—শীতে কাঁপছে সে। গায়ের মোটা শীতবস্ত্রের ভিতর দিয়েও তার দেহের উত্তাপ অনুভব করলাম আমি—যেন চুম্বনের মতই মধুর সে উত্তাপ। কারও মুখে কথা নেই, নীরব নিশ্চল বসেছিলাম সবাই। বিপদসঙ্কুল রাত্রির এই গভীর অন্ধকার, তবুও আজ যেন সুখী আমি। এই অন্তরভেদী শীতলতা, এই সর্ব্বনাশী বিপদ, এই অন্ধকার রাত্রি—তবু ও এ যেন পরম সৌভাগ্য আমার।

আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করলাম—কিসের এই আনন্দ? হৃদয়ের এই উৎফুল্লতা কেন আমার? কে বলবে এ কথা? একি সে কাছে আছে বলে? কিন্তু কে সে? এক ইংরেজ বালিকা, তাকে এখন ও আমি চিনি না। কখনও ভালবাসিনি তাকে, এখন পর্য্যন্ত জানি না। কিন্তু তবু ও কি জানি কেন আমি অভিভূত হয়েছি। তা'রই জীবন বাঁচাতে নিজের জীবন বলি দিয়ে আমি ধন্য হ'তে চাই। অদ্ভুত! কি করে নারী জাতি আমাদের এমনি ভাবে অভিভূত করে? একি তার দেহের সৌন্দর্য্য যা এমনি করে আমাদের মুগ্ধ করে? এ তার যৌবনের আকর্ষণ, না দেহের আকর্ষণ মদের মত যাহা পুরুষ জাতিকে রাত্রিদিন মাতাল করে রাখে?

অন্ধকারের নিস্তব্ধতা ভীষণতর হয়ে উঠল, সীমাহীন আকাশের অন্তহীন নীরবতা সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করছিল যেন। সেই শব্দহীন

রাজ্যে এক অদ্ভুত শব্দ—আমাদের চারদিকে জল ক্রমাগত বেড়ে চলছিল, ঢেউগুলি এসে আছড়ে পড়ছিল জাহাজের গায়ে।

সব চেয়ে ছোট মেয়েটী কাঁদছিল, পিতা তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিলেন তাদের নিজের ভাষায়—তা আমার বুঝবার কথা নয়।

নিকটবর্ত্তিনীকে জিজ্ঞাসা করলাম—খুব বেশী শীত লাগছে না ত ?

—ও! শীতের কথা বলছেন? এই দেখুন আমার সমস্ত শরীর যেন জমে গেছে একেবারে।

গা থেকে আমার ওভারকোটটা খুলে ফেললাম, কিন্তু সে নিতে অস্বীকার করলে। কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তার শরীরটা আমি ঢেকে দিলাম এ দিয়ে।

কিছুক্ষণের জন্য বায়ু আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল, সমুদ্রের জল জাহাজের জীর্ণদেহকে এসে আরও জোরে আঘাত করতে লাগল। একবার উঠে দাঁড়ালাম আমি। একটা দমকা হাওয়া এসে আমার মুখে লাগল, দুইগণ্ডে কে আমাকে সবলে আঘাত করল যেন।

ক্রমবর্দ্ধিত বায়ুর বেগ প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের সন্ত্রাস বাড়িয়ে দিচ্ছিল। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দেখলাম সফেন তরঙ্গরাশি একবার উঠছে আবার পড়ছে। ঢেউগুলি মেরীজোসেফের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছিল, মৃত প্রায় জাহাজকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল, আমাদের দেহের মধ্যদিয়ে হৃদয়কে স্পর্শ করছিল এ কম্পন।

একবার বুঝলাম নিকটবর্ত্তিনী কাঁপছে। আমার দেহে আমি সে কম্পন অনুভব করছিলাম।

আমাদের নীচে, আমাদের সামনে, পিছনে, ডানে, বায়ে উপকূলের গায়ে আলোকস্তম্ভ গুলি জ্বলছিল। প্রকাণ্ড দৈত্যচক্ষুর মত সেগুলি আবর্ত্তিত হচ্ছিল যেন আমাদের চারদিকে। মনে হচ্ছিল আমাদের

দিকেই চেয়ে আছে ওরা—প্রতীক্ষায় রয়েছে পাঁচটা জীবনদীপ নিভে যাবে এই মুহূর্ত্তেই, দেখে দেখে আনন্দ অনুভব করছিল যেন।

ইংরেজ ভদ্রলোক মাঝে মাঝে এক একবার দিয়াশলাই জ্বেলে ঘড়ি দেখছিলেন। আবার তখনই পকেটে রেখে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে খুব গম্ভীরস্বরে বললেন—"নববর্ষে আপনার মঙ্গল হউক।"

বুঝলাম মধ্য রাত্রি। হাতখানা এগিয়ে দিলাম। আদরে সে হাত গ্রহণ করে তিনিও সম্ভাষণ জানালেন। ইংরেজী ভাষায় কি বললেন তিনি—চারিটী ইংরেজ কণ্ঠ গান গেয়ে উঠল—"God Save the Queen" অন্ধকার নীরব বায়ুস্তর ভেদ করে শূন্যে অনন্তে মিলিয়ে গেল সে স্বর।

গান শেষ হ'ল। নিকটবর্ত্তিনীকে অনুরোধ করলাম একটা গাথা গাইতে। একাকী গাইবে সে—যা তার খুসী—সমস্ত ভয় বিপদ ভুলে যাবো আমরা। সে সম্মত হ'ল, সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর নৈশ অন্ধকার ছাপিয়ে উর্দ্ধে উঠল। করুণ স্বরে কি যেন গাইছিল সে—সুরের মূর্চ্ছনা আহত পাখীর মতই তরঙ্গের উপর উড়ে উড়ে চলছিল যেন।

সাগর জল বারবার এসে জীর্ণ জাহাজকে আঘাত করছিল কিন্তু আমি এইমাত্র-বিলীন সেই কণ্ঠস্বরই ভাবছিলাম। সাইরেন রমণীদের কথা মনে হ'ল আমার। সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন জাহাজ চলে যায় যদি! কি বলবে তবে নাবিকেরা? আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ, সমস্ত ভয় ভাবনা স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল। সাইরেন! কবিকল্পিতা কোকিল-কণ্ঠি কুহকিনী সেই সমুদ্র নারী! একি সেই সাইরেন, সেই সাগর দুহিতা? এই মুমূর্ষু জাহাজের উপর এ আকর্ষণ তবে কিসের? এই মুহূর্ত্তেই সাগরের অতলতলে ডুবে যাবো কিন্তু তবুও হৃদয় আমার কেঁপে উঠছে না কেন?

হঠাৎ পাঁচজনেই আমার ডেকের উপর গড়িয়ে পড়লাম। মেরী জোসেফের ডানদিক ডুবে গেছে। বালিকা আমার গায়ের উপর এসে পড়ল। কি করছি ভেবে দেখবার সময় ছিলনা, মনে হ'ল এই শেষ মুহূর্ত। দুই হাতে জড়িয়ে ধরলাম তাকে, অজস্র চুম্বনে ভরে দিলাম তার চিবুক, কপোল, সোনালী চুলের রাশি।

জাহাজ নড়লনা, একটু দুলেই স্থির হয়ে দাঁড়াল আবার। আমরাও উঠে বসলাম। পিতা ডাকলেন—কেটী ?

তখনও সে আমার দুই হাতের মধ্যে, উত্তর দিলে—"এই যে আমি।" নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলে। সেই মুহূর্তে আমার ইচ্ছা হ'ল—জীর্ণ জোসেফ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে অনন্ত সাগরগর্ভে ডুবে গেলনা কেন ?

ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন—একটু সামান্য ধাক্কা। বিশেষ কিছু নয়। সবাই আমরা নিরাপদ তবে।

এই সময়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম, দেখলাম আমাদের নিকটেই একটা আলো। আমি চীৎকার করলাম, সেখান থেকে সাড়া এল। হোটেলাধ্যক্ষ অবস্থা বুঝে নৌকা পাঠিয়েছে আমার জন্য।

এখন আর ভয় নেই আমাদের। কিন্তু কি জানি কেন এ ভাল লাগছিলনা আমার। আমাদের সবাইকে তুলে সেণ্টমার্টিনে নিয়ে এল।

ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন, খুব বাঁচা গেছে আজ। বেশ একটা নৈশ ভোজ চাই। কিন্তু আমার মনে আনন্দ নেই। আমি মেরী জোসেফের কথাই ভাবছিলাম।

পরদিন সবাই বিদায় নিলাম, সম্ভাষণের পর শপথ করলাম সবাই চিঠি লিখব সবার কাছে। তারা বিয়ারিজ চলে গেল।

দুই বছর কেটে গেল। এরপরে আর কোন সংবাদ নেইনি তাদের। হঠাৎ নিউইয়র্ক থেকে একখানা চিঠি পেলাম। তার বিয়ে হয়েছে, সেই

কথাই জানিয়েছে আমাকে। তারপর থেকে প্রতি নববর্ষে আমরা পরস্পরকে লিখে আসছি। সে আমাকে লেখে তার জীবনের কথা, তার সন্তানের কথা, তার সেই বোনদের কথা, কিন্তু একদিন তার স্বামীর কথা লেখেনি আমাকে। কিন্তু কেন? আর আমি লিখি—মেরী জোসেফের কথা। সম্ভবতঃ এই একমাত্র রমণী যাকে ভালবেসেছিল আমি, অন্ততঃ ভালবাসতে পারতাম। কিন্তু কে বলতে পারে মানুষের অবস্থা মানুষকে চালায়—তারপরে—সবাই চলে যায় একদিন। মনে ভাবছি আজ সে নিশ্চয়ই বার্দ্ধক্যে এসে দাঁড়িয়েছে। হয়ত চিনতে পারবোনা আর তাকে। কিন্তু সেদিনের সেই! সেই জীর্ণ জাহাজ! সে লিখেছে তার চুলগুলি পেকে উঠেছে। ব্যথা লাগছে শুনে। সেই সোনালী চুল! না, না, আমার সেই ইংরেজ বালিকা, আজ আর সে নেই। কি দুঃখ!



চিরস্থায়ী প্রেম

শিকারের ঋতু আরম্ভ হবে তারই আনন্দে এ ভোজ। আহার প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সুসজ্জিত টেবিলের চারিদিকে বন্ধুবান্ধব অতিথি পরিবেষ্টিত মার্কুইস বার্টনি। আলোচনা চলছিল পূর্ণ উৎসাহে, বিষয়-বস্তু প্রেম। আলোচনা জমে গেল শিগগিরিই—সেই পুরাতন প্রশ্ন—জীবনে একবারের বেশী ভালবাসা সম্ভব কিনা। জীবনে একবারেই যারা ভালবেসেছিলেন নজির স্বরূপ তাদের উল্লেখ হ'স কিন্তু প্রতিবাদ স্বরূপ এলেন তারা—উত্তাল প্রেম-সাগরে যারা বহুবার হাবুডুবু খেয়েছেন। পুরুষ যারা উপস্থিত ছিলেন সবাই তারা একমত। তাদের কথা—অন্যান্য রোগের মত প্রেম রোগও একই ব্যক্তিকে একাধিকবার আক্রমণ করতে পারে, অবশ্য প্রথম আক্রমণেই রোগীর যদি মৃত্যু না ঘটে। পুরুষ মহলে এর প্রতিবাদ করবার কেউ ছিলনা কিন্তু নারীদের মতামত বাস্তবের চেয়ে কবিতা ও কাব্যের উপরই বেশী নির্ভর করে। তাই মহিলা-মহল বিরুদ্ধপক্ষ দাঁড়ালেন—একবাক্যে বললেন সবাই—ভালবাসার উন্মাদনা মানুষের জীবনে একবার বই ছুবার আসে না। তাদের কথা—ভালবাসা বিদ্যুতের মতো। যে হৃদয়কে একবার সে স্পর্শ করে তখনই ধ্বংস করে তাকে, দগ্ধ করে চিরদিনের মতো তাকে মরুভূমি করে রেখে যায়। আর কোন প্রকার কোমল ভাব সে ভূমিতে জন্ম নিতে পারে না। এমন কি সে দগ্ধ হৃদয় স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখে না।

মার্কুইস নিজেই জীবনে বহুবার প্রেম-নাট্যের অভিনয় করেছেন নায়করূপে সুতরাং মহিলামহলের এ সিদ্ধান্ত প্রতিবাদ তিনি না করে পারেন কি ক'রে? সুস্পষ্ট গম্ভীর ভাবে বললেন তিনি—আমি বলছি,—

একই হৃদয় এবং একই আত্মার পক্ষে জীবনে বহুবারই ভালবাসা সম্ভব। প্রেমের জন্য জীবন যারা উৎসর্গ করেছেন, তোমরা তাদের কথা বল্‌ছ। সত্য কথা, জীবনে দ্বিতীয়বার তারা ভালবাসেননি। কিন্তু আমি বাজি রেখে বলতে পারি—হতভাগারা যদি নির্বোধের মত আত্মহত্যা না করত, এইভাবে ভালবাসার পথ তাদের যদি চিরদিনের মত রুদ্ধ হয়ে না যেত, নূতন প্রেমের সন্ধান এবং স্বাদ তারা পেতই—শুধু একবার নয় বহুবারই। ভালবাসা ঠিক মদের মতই—একবার যে এ ফাঁদে পা দিয়েছে চিরদিন তাকে এর দাসত্ব করতেই হবে। ভালবাসা মানুষের প্রকৃতি।

সবাই মিলে এক বৃদ্ধ ডাক্তারকে ধরলেন—এ প্রশ্নের মীমাংসা করবেন তিনি মধ্যস্থ হয়ে।

ভালবাসা মানুষের প্রকৃতিগত এ বিষয়ে মার্কুইসের সঙ্গে তিনিও একমত। তবু এক প্রেমের কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত তিনি। তারই এ ইতিহাস। তিনি বললেন:

কিন্তু আমি এক প্রেমের কথা জানি, দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর চলছিল তা, একটী দিনের জন্য এ প্রেমে ছেদ পড়েনি, শুধু মৃত্যুই এর মধ্যে বিচ্ছেদ টেনে এনেছিল। মার্কুইস পত্নী হাত তালি দিয়ে উঠলেন—কি সুন্দর! এ ভালবাসার স্বপ্নও মধুর! পঞ্চান্ন বছর ধরে গভীর প্রেম! একদিনের জন্যও বিচ্ছেদ নেই! কি সুখী এরা! কথা শুনে ডাক্তার একটু মৃদু হাসলেন; বললেন:—এ বিষয়ে আপনার ভুল হয়নি ম্যাডাম। যে ব্যক্তি ভালবাসা পেয়েছিল সে ছিল পুরুষ। ভদ্রলোক আপনার অপরিচিত নয়। কেমিষ্ট মঁসিয়ে চুকাকে আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আর স্ত্রীলোকটী তাকেও চেনেন আপনি। প্রতিবারই সে আসত এদিকে চেয়ার মেরামত করতে।

মহিলাদের উৎসাহ যেন দমে গেল অনেকটা। কেউ কেউ একটু

নাসিকা কুঞ্চিত করলেন। নগণ্য সাধারণের এ প্রেম-কাহিনী, এতে তাদের আকর্ষণের কি আছে?

ডাক্তার আবার আরম্ভ করলেন—প্রায় তিন মাস আগে স্ত্রীলোকটার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুশয্যার পাশে সে আমাকে ডেকেছিল। গিয়ে দেখি যাজক আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের দুজনকে সে তার উইলের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করবে এই তার ইচ্ছা। যাতে সব কিছু বুঝতে পারি এজন্য তার জীবন-ইতিহাস খুলে বললে আমাদের কাছে। অদ্ভুত এবং চিত্তাকর্ষক এ কাহিনী। পিতামাতা দুজনেই চেয়ার মেরামত করে জীবিকা নির্ব্বাহ করত। কোনদিন ছাদের নীচে বাস করেনি তারা। মলিন অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে ক্ষুধার্ত্ত বালিকা পিতামাতার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে বেড়াত। কত সহর বেড়িয়েছে তারা; ঘোড়া, গাড়ী এবং কুকুর সহরের বাইরে রেখে যেত। একাকী বালিকা সেখানে বসে খেলা করত। পিতামাতা সহরে চেয়ার মেরামত করে ফিরে আসত। কারও সঙ্গে প্রায় কোন কথা বলত না তারা। শুধু হাঁক শোনা যেত—চাই চেয়ার! চেয়ার মেরামত!

কখন কখন বালিকা চলতে চলতে দূরে চলে যেত। ক্রুদ্ধ পিতা কর্কশ-কণ্ঠে পিছন থেকে তাকে ডাকত। একদিনের জন্যও স্নেহের আহ্বান শোনেনি সে। একটু বড় হয়ে নিজেও সে পিতামাতার সঙ্গেই কাজে লেগে গেল। বাড়ী বাড়ী থেকে চেয়ার নিয়ে আসত, পিতামাতা মেরামত করত সেগুলি, বয়ে সে দিয়ে আসত আবার। রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমল, কিন্তু এদের পিতামাতা প্রায়ই তাকে পছন্দ করত না। তাই ছেলেদের তারা ডেকে নিয়ে যেতেন। ভদ্রলোকের সন্তান—এই খালিপা মেয়েটার সঙ্গে কথা বলবে তারা! কখনো কখনো ছেলেগুলি তাকে ঢিল ছুড়ত। একবার এক দয়াশীলা মহিলা স্নেহপরবশ হয়ে

তাকে কয়েকটী পেনি দিয়েছিলেন। বালিকা সযত্নে সেগুলি জমা করে রাখল।

একদিন—তখন বয়স তার এগার বছর, সহরের পথ দিয়ে চলছিল সে। সমাধিক্ষেত্রের পিছনে বালক চুকার সঙ্গে তার দেখা। বালক চীৎকার করে কাঁদছিল, খেলার সাথী তার ত্ব'ত্বটো কল চুরি করে নিয়েছে। সম্রান্ত ঘরের ক্ষুদ্র বালক—কত লোকের কত আকাঙ্ক্ষার ধন সে—তার চোখে জল! বালিকা জানে—এরা ত্বঃখ কাকে বলে জানেনা—তাই এ দৃশ্য তাকে অভিভূত করলে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তার কাছে, ত্বঃখের কারণ জেনে নিয়ে এতদিনের সঞ্চয় গুঁজে দিল হাতের মধ্যে তার। বালক বিনা দ্বিধায় সেগুলি গ্রহণ করলে, তারপরেই চোখের জল মুছে ফেলল সে। আনন্দে অধীর হয়ে বালিকা তাকে চুম্বন করলে। বালক পেনিগুলি গুনছিল, অন্য কোন দিকে মন ছিল না তার। বাধা না পেয়ে বালিকা ত্বই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলে, দৃঢ়ভাবে একবার আলিঙ্গন করে ছুটে পালিয়ে গেল।

তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে—কি চলছিল সেখানে, কে তার খবর রাখে? এতদিনের সঞ্চয় তার, কিসের জন্য বিসর্জ্জন দিলে সে? এত সাধের পেনিগুলি না বুঝেই দিয়ে ফেলল সে, তাই কি তার এ উন্মত্ত আকর্ষণ? অথবা জীবনে এই তার প্রথম সস্নেহ চুম্বন,—একি তারই ফল? এ রহস্য বালক বালিকাদের কাছেও যেমন বয়স্কদের পক্ষেও তেমনি। বালিকা কয়েক মাস ধরে স্বপ্ন দেখল—সমাধিক্ষেত্রের পিছনে সেই স্থান-টুকু আর অই বালক। পিতামাতার বাজারের পয়সা থেকে এবং চেয়ার মেরামত থেকে ত্ব'এক পয়সা চুরি করত সে মাঝে মাঝে। সমাধির পাশে আবার যখন ফিরে এল তখন ত্বই ফ্রাঙ্ক জমা হয়েছে তার কাছে। কিন্তু বালক—সে যে নাই সেখানে। খুঁজে খুঁজে বালিকা তাকে

আবিষ্কার করলে তার পিতার অষুধের দোকানে। বাক্সের একদিকে একটা লাল রংয়ের গোলক, অন্য দিকে নীল রংয়ের। গোলকের উজ্জ্বলতা তার আকর্ষণের বস্তুকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছিল যেন। এ দিনের দৃশ্য জীবনে সে ভোলেনি কখনো। পর বছর বালকের সঙ্গে তার দেখা স্কুলের কাছে, বালক মার্বেল খেলছিল। ছুটে গিয়ে দুই বাহু দিয়ে সে তাকে জড়িয়ে ধরলে। এমন উন্মত্ততাতে সে তাকে চুম্বন করলে যে বালক চীৎকার করে উঠল। বালককে শান্ত করতে বালিকার যা কিছু ছিল দিয়ে দিল তাকে। তিন ফ্রাঙ্ক এবং বিশ সেণ্ট। বালকের কাছে সত্যিকার সোনার খনি এ—বালক অবাক হয়ে চেয়ে রইল সেদিকে।

এরপরে বালিকার অজস্র যথেচ্ছ চুম্বনে বালকের আর কোন আপত্তি রইল না। পরবর্ত্তী চার বছর বালিকার সমস্ত সঞ্চয়ই বালকের হাতের মধ্যে এসে পড়তে লাগল। বালক বিনা দ্বিধায় সমস্ত জেনে শুনেই তা গ্রহণ করতে লাগল কয়েকটা চুম্বনের বিনিময়ে। একবার ত্রিশ সু, আর একবার দুই ফ্রাঙ্ক। তৃতীয়বারে বালিকার সঞ্চয় ছিল মোটে বার সু। কি করে এ নিয়ে সে তার কাছে যাবে? দুঃখে লজ্জায় বালিকার বুক-ফেটে কান্না এল। কি দুর্ভাগা বছর! কিন্তু পর বছরে এল পাঁচ ফ্রাঙ্ক, আনন্দে বালিকার মুখে হাসি আর ধরে না। মনে একমাত্র বালকের চিন্তা তার, অধীর উৎকণ্ঠায় তার পথ চেয়ে রইল সে। কোন কোনদিন বালক নিজেই আসত তার কাছে, অধীর আনন্দে বালিকার হৃদয় দুরুদুরু কাঁপত। হঠাৎ একদিন বালক কোথায় অন্তর্দ্ধান করলে। সযত্ন অনু-সন্ধানে বালিকা আবিষ্কার করলে বোর্ডিং-স্কুলে পড়তে গেছে সে। কৌশলে বালিকা বালকের পিতামাতার সম্মতি আনলে, গ্রীষ্মের ছুটীর পরে বালকের স্কুলের পথ বদলে গেল। এক বছর পরে সে কৃতকার্য্য হয়েছিল এ কাজে। দুই বছর দেখেনি সে তাকে, চিনতে পারা যায় না।

একেবারে—বদলে গেছে সে। একটু লম্বা হয়েছে, দেখতে আরও সুন্দর হয়েছে, পিতলের বোতামগুলি কেমন জমকালো দেখায় তার! কিন্তু বালক তাকে দেখেও দেখল না, তার দিকে একবার না তাকিয়েই চলে গেল। ক্রমাগত দুইদিন বালিকা কাঁদল। সেইদিন থেকে তার ভালবাসা এবং দুঃখ একই সঙ্গে চলল অচ্ছেদ্য ভাবে।

প্রতি বছর বালক গৃহে ফিরত, বালিকা তার কাছে কাছে ঘুরত কিন্তু চোখ তুলে তাকে দেখবার সাহস হতনা তার। আর বালক? এই নগণ্য বালিকা কে তার? সম্ভ্রান্ত সে, কেন এই হীন বালিকার প্রতি তাকাবে সে? নিরাশায় বেদনায় বালিকার প্রেম উন্মত্তের মত বেড়ে উঠতে লাগল।

আমাকে সে বলেছে—

একমাত্র পুরুষ তাকেই আমি চোখে দেখেছিলাম। জগতে আর কোন পুরুষ আছে কিনা জানতাম না আমি।

বালিকার পিতামাতার মৃত্যু হ'ল। তাদের ব্যবসাই সে নিলে। কিন্তু অন্তর তার পড়ে থাকত যেখানে চুকা থাকে। একদিন সে দেখল ফার্ম্মেসী থেকে চুকা ফিরছে, সঙ্গে এক তরুণী তার হাত ধ'রে। সে বুঝল তরুণী কে। সেই রাত্রেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর জলে। এক মাতাল সেই পথ ধরে চলে যাচ্ছিল। টেনে তুললে সে তাকে এবং চুকার ফার্ম্মেসীতেই নিয়ে গেল। যুবক চুকা এল ডাক্তার—তাকে বাঁচাবে সে। রোগিণীর মুখের পানে না চেয়েই তার পরিচ্ছদ খুলে ফেলল সে, দুই হাতে অচেতন দেহটার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মর্দ্দন আরম্ভ করলে। রোগিণীর চৈতন্য সঞ্চারিত হ'ল, কর্কশকণ্ঠে তাকে ডেকে বললে চুকা—পাগল তুমি! এমন পাগলামিও লোকে করে!

এই কণ্ঠস্বর তাকে নূতন জীবন দিল। এত সেই! তারই সঙ্গে

কথা বলছে ! বহুদিন পরে আজ আবার সে সুখী। তার জীবন রক্ষার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করেছে চুকা। সে তার পরিশ্রমের মূল্য দিতে চাইলে কিন্তু চুকা কিছু নিলে না।

এই ভাবে সমস্ত জীবন কেটেছে তাঁর। নিজের কাজ করত আর রাতদিন তারই কথা ভাবত। চুকার ফার্ম্মেসী থেকে সে অষুধ কিনত। তবু ত দুটো কথা বলতে পাবে, এক আধবার দেখা হবে, নিজের যা কিছু আছে তারই কাছে যাবে এইভাবে।

আগেই বলেছি এই বসন্তকালে মরেছে সে। এই করুণ অধ্যায় শেষ করে আমাকে অনুরোধ করলে জীবনের সঞ্চয় তার আমাকেই বয়ে নিয়ে যেতে হবে তার প্রণয়ীর নিকট। এতদিন সে যে পরিশ্রম করেছে সে তারই জন্য। মৃত্যুতেও চুকার জন্য রেখে যাবে সে—জীবনে তা'হলে সে তাকে ভুলবে না। দেহের সৎকারের জন্য যাজককে দিলাম পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক। পরদিন সকালে চুকার বাড়ীতে গেলাম। মুখোমুখী দুজনে বসে প্রাতঃকালীন আহার সমাধা করছিল তারা দুজনে। সাদরে আমাকে অভ্যর্থনা করে বসাল। আমাকে কাফি পান করতে অনুরোধ করলে, আমি তা গ্রহণ করলাম। তারপরে কম্পিতকণ্ঠে আমার কথা আরম্ভ করলাম, ভয়ছিল এতখানি ব্যথা তাদের অন্তরে না জানি কোনখানে গিয়ে আঘাত করে বসে। তাদের চোখে নিশ্চয়ই অশ্রুর বান ডেকে নিয়ে আসবে। কিন্তু আমার কাছেই চুকা প্রথম শুনলে—একটা ভবঘুরে, এতদিন ধরে যে চেয়ার মেরামত করেছে সেই তাকে ভালবেসেছিল। ঘৃণায় সে নাসিকা কুঞ্চিত করলে, মনে হ'ল তার সম্ভ্রান্ত জীবনের মর্য্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তার ব্যক্তিগত মর্য্যাদা জীবনের চেয়েও প্রিয় কিন্তু এক মুহূর্ত্তেই নষ্ট হয়ে গেল যেন। উত্তেজিত পত্নী তার বারবার বলতে লাগল—হতভাগা ভিক্ষুকটা ! সেই পোড়ারমুখী !

তাকে ভালবাসতে গেছেন মঁসিয়ে চুকা! এ কথা বিশ্বাস করলেন আপনি!

চুকা বলবার মত শক্ত কথা কিছু খুঁজে পেলেনা। দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারি করতে লাগল সে। বিড় বিড় ক'রে অনুচ্চস্বরে নিজমনে বলতে লাগল—কি বীভৎস! বুঝেছ তুমি ডাক্তার! হতভাগাটা জীবিত থাকতে যদি জানতাম, তাকে পুলিসে দিতাম, জেলে দিয়ে তবে ছাড়তাম আমি। শপথ ক'রে বলছি কিছুতেই এর অন্যথা হ'তনা।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এরপরে কি করব, কি বলব ভেবে পেলাম না। তবুও চেষ্টা ক'রে দেখতে হবেত। সসঙ্কোচে বললাম—কিন্তু সে আমাকে অনুরোধ করেছে তার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় তোমাকে দিতে—তিন হাজার পাঁচ শত ফ্রাঙ্ক। কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এটা নেওয়া হয়ত তুমি আর পছন্দ করবে না। আমার মনে হয় টাকাটা বরং তার চেয়ে গরীব দুঃখীদের দিয়ে দেওয়াই ভাল। কি বল তুমি?

তারা একবার আমার মুখের দিকে ফিরে চাইলে—চুকা এবং তার স্ত্রী দুই জনেই উভয়েই যেন বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য। পকেট থেকে টাকাগুলি তুললাম। সমস্ত দেশের সব রকম মুদ্রা একসঙ্গে। পেনি এবং স্বর্ণমুদ্রা দুইই আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তা'লে তুমি কি কর্ত্তব্য মনে করছ?

প্রথম কথা বলল চুকার পত্নী।

—স্ত্রীলোকটা যখন তার অন্তিম ইচ্ছা একটা প্রকাশ করেছে তখন এ ফিরিয়ে দেওয়া আমাদের উচিত হবেনা এইত আমি মনে করি। স্ত্রীর কথা শুনে চুকা বললে—

—হাঁ আমিও তাই ভাবছি। এ দিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক কিছু আমরা কিনতে পারবো। কি বল?

শুষ্ককণ্ঠে নিরপেক্ষ ভাবে উত্তর দিলাম—তুমি যা ভাল মনে কর।

সে বললে—সে যখন বলেছে তোমাকে, টাকাটা এখানে রেখেই যাও। তারপরে ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে এ দিয়ে।

টাকাটা তার হাতে দিয়ে একটা নমস্কার ক'রে বেরিয়ে এলাম।

পরদিন ভোরে চুকা আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত এবং সরাসরি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—

—আচ্ছা, সেই স্ত্রীলোকটার গাড়ী ছিলনা? কি করেছ সেটা?

—ঠিকই আছে তা। তোমার ইচ্ছা হয় নিয়ে যেতে পার।

—হাঁ, সেইটে নিতেই আমি এসেছি।

এই ব'লে সে যেতে উদ্যত হ'ল। আমি তাকে ডেকে বসালাম—

—তার বুড়ো ঘোড়াটা এবং দুটো কুকুরও আছে এখনে। এগুলি নিয়ে যাবে কি?

সে অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকালে। তারপর বললে—

—না, না, ওগুলির দরকার নেই আমার। কি করবো আমি ওগুলি দিয়ে?

—তোমার যা ইচ্ছা তাই করবে তুমি।

একটু হেসে সে হাতখানা বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে। আমি হাতখানা ধরলাম। এ ছাড়া কি করবার আছে? একই দেশে থেকে অষুধ বিক্রেতার সঙ্গে ডাক্তারের শত্রুতা করা সাজেনা। কুকুর দুটাকে রেখে দিলাম আমি। বুড়ো ঘোড়াটা যাজক নিলে। গাড়ীটা চুকা কি

কাজে লাগালে, টাকা দিয়ে সে রেলওয়ে ষ্টক কিনলে। জীবন সরল অনাড়ম্বর প্রগাঢ় ভালবাসার এই একটী মাত্র উদাহরণই আমি জানি!

কথা শেষ করে ডাক্তার সবার মুখের দিকে একবার তাকালেন। মার্কুইস পত্নী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, চোখে জল—

এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই, ভালবাসতে কেবল মেয়েরাই জানে।



মেকী রত্ন

মেয়েটীর সঙ্গে মঁসিয়ে লঁাতিনের দেখা এক ভোজে এবং সেইখানেই তিনি মুগ্ধ হন তার প্রেমে।

বালিকা এক ট্যাক্স কালেক্টরের কন্যা। কয়েক বছর আগে পিতার মৃত্যু হয়েছে। মাতা কন্যাকে নিয়ে তারপরেই আসেন প্যারিসে। প্রতিবেশী পরিচিত গৃহে কন্যার বিবাহ-যোগ্য বরও অনুসন্ধান করেছেন। খুব সাধারণ গৃহস্থ তারা তবুও ভদ্র এবং সম্মানিত।

ভাল মেয়ে বলে বালিকার সুনাম সর্ব্বত্র। সবাই বলে এমন মেয়েদের হাতে যে কোন পুরুষ তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হতে পারে। বালিকার সহজ সৌন্দর্য্য সৌজন্য এবং বিনয়ের সঙ্গে মিলে সবাইকে আরও মুগ্ধ করে। মুখে তার হাসি লেগেই আছে, বালিকার পবিত্র অন্তর প্রতিফলিত হয় সে মুখে। চারদিকের লোকে বলাবলি করে এ মেয়ের ভালবাসা যে পাবে সেই সুখী।

মঁসিয়ে লঁাতিন ডিপার্টমেণ্টের বড় বাবু। সাড়ে তিনশ ফ্রাঙ্ক তার মাইনে সুতরাং প্রস্তাব করে নিরাশ হ'য়ে ফিরতে হ'লনা তাকে।

বালিকাকে বিয়ে করে লঁাতিন আজ অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখী। রমণীর মিতব্যয়িতায় মনে হ'ত কি প্রাচুর্য্যের মধ্যেই বাস করছে তারা। স্বামীর সুখ সুবিধার দিকে তার সর্ব্বদাই সতর্ক দৃষ্টি। বিয়ের পরে ছয় বৎসর অতীত হয়েছে কিন্তু লঁাতিনের মনে হচ্ছে স্ত্রীকে যেন তিনি দিনদিন আরও বেশী ভালবাসছেন।

স্ত্রীর দুটী রুচি কেবল লঁাতিনের খারাপ লাগত। প্রথমতঃ স্ত্রী তার একটু বেশী মাত্রায় থিয়েটার প্রিয়, দ্বিতীয়তঃ সে মেকী গয়না পরতে

ভালবাসে। পত্নীর কেরাণীপত্নী বন্ধুরা তার জন্য থিয়েটারে বক্স ভাড়া কর, প্রায়ই নূতন অভিনয়ের প্রথম দিনে। স্বামীকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সঙ্গী হতে হত। সমস্ত দিন অফিসের পরে এ কিছুতেই ভাল লাগত না তার।

কিছুদিন পরে মঁসিয়ে লাঁতিন স্ত্রীকে অনুরোধ করলেন সে যেন তার কোন বন্ধুকে নিয়েই থিয়েটারে যায় এবং সেই তাকে বাড়ীতে পৌছে দিবে। নূতন ব্যবস্থায় স্ত্রী প্রথমে ভয়ানক আপত্তি জানালে, কিন্তু অনেক অনুরোধের পরে কেবল মাত্র স্বামীর সুবিধার জন্যই রাজী হ'ল।

ম্যাডাম লাঁতিনের পোষাক পরিচ্ছদ সাদাসিদে, খুব সহজ এবং সাধারণ রুচিসম্মত কিন্তু সে কানে পরত বড় বড় রাইনষ্টোন, সত্যিকার হীরার মতই ঝকঝক করত তা। গলায় পরত মেকী মতীর মালা, হাতে পরত মেকী সোনার ব্রেসলেট, মাথার চিরুণীতে কৃত্রিম কাচের মণি বসান।

স্বামী প্রায়ই প্রতিবাদ করতেন: যখন সত্যিকার গয়না কিনতে পারছো না। তোমায় সহজ সৌন্দর্য্য নিয়েই সবার সামনে দাঁড়ান উচিত। সেই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু রমণী হেসে উত্তর দিত: কি করব বল। গয়না আমি ভালবাসি, এ আমার দুর্ব্বলতা। প্রকৃতিকে বদলাব কি ক'রে?

মোতীর হারটা নিয়ে আঙুলে জড়াতে থাকত, মণিগুলি জ্বলজ্বল করত, স্বামীর দিকে চেয়ে রমণী জিজ্ঞাসা করত: দেখ, সুন্দর নয় কি? কে বলবে এরা মেকী? স্বামী হেসে উত্তর দিতেন—তোমার রুচি বোহেমিয়ান।

এক একদিন সন্ধ্যায় সামনা সামনি বসত তারা দুজনে আগুনের ধারে। চায়ের টেবিলের উপরে মরক্কো লেদার বাক্সে থাকত সেই

অপদার্থগুলি। মসিয়ে ল'াতিন তাদের অপদার্থই বলতেন। রমণী কৃত্রিম গয়না গুলিকে অভিনিবেশ সহকারে চেয়ে দেখত যেন কোন গভীর গোপন আকর্ষণের বস্তু তারা। সময়ে সময়ে একটা হার স্বামীর গলায় পরিয়ে দিত, হাততালি দিয়ে হেসে উঠত, কেমন পুতুলের মত দেখাচ্ছে তোমাকে।"

একরাত্রে অপেরা থেকে ঠাণ্ডা লেগে সে ফিরে এল। আটদিন পরে নিউমোনিয়ায় মৃত্যু হল তার।

শোকে দুঃক্ষে ম'সিয়ে ল'াতিন খুবই ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন একমাসের মধ্যে মাথার চুল তার সব সাদা হয়ে গেল। সমস্ত দিন রাত তিনি কাঁদতেন। সেই মধুর হাসি, সেই কণ্ঠস্বর, সেই হাবভাব মনে করে বুক ফেটে যেত তার।

সময় চলল কিন্তু দুঃখের পরিমাণ তার একবিন্দু কমল না। অফিসে সহকর্মীরা নানা চলতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করত, ম'সিয়ে ল'াতিনের দুই চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠত। কান্না রোধ করতে পারতেন না। স্ত্রীর কক্ষের কোন বস্তুতে তিনি হাত দেননি। সমস্ত আসবাব এমনকি স্ত্রীর পরিধানের বস্ত্র পর্য্যন্ত তার মৃত্যুর আগের দিন যেমন ছিল আজও তেমনই রয়েছে। প্রতিদিন এক সময়ে নির্জ্জনে এখানে এসে তিনি বসতেন, ভাবতেন তারই কথা—এক সময় যে ছিল তার চোখের মনি, তার জীবনের সমস্ত আনন্দ।

কিন্তু জীবন যাত্রা শীগগিরই দুর্ব্বহ হয়ে পড়ল। স্ত্রীর ব্যয়ে আয় তার মনে হ'ত যথেষ্ট। সমস্ত ব্যয় ভার নির্ব্বাহ হত প্রাচুর্য্যের মধ্যে দিয়েই কিন্তু আজ আর কিছুতেই চলছেনা তার। এমনকি খুব সাধারণ অভাব গুলিও মিটছেনা এতে। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতেন, স্ত্রী কি করে এমন সুন্দর সুন্দর জিনিষ, অমন ভাল ভাল মদ আনত এ দিয়ে।

শীগগিরই তাকে দেনা করতে হ'ল, ক্রমে গভীর দৈন্যে পড়লেন তিনি। একদিন ভোরে দেখলেন পকেটে একটা পয়সা নেই, মনে হ'ল একটা কিছু বিক্রি করা যাক। প্রথমেই মনে পড়ল মেকী গয়নার কথা কারণ স্ত্রীর এই রুচি, এই লোক ঠকানো প্রবৃত্তির কথা মনে হ'লেই মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ক্ষুন্ন হ'ত তার।

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই সে নূতন নূতন গয়না নিয়ে ফিরত। ম'সিয়ে ল'াতিন সেইগুলিকে নিয়ে দেখতে লাগলেন। অবশেষে স্থির করলেন সব চেয়ে বড় হারটাই বিক্রি করবেন। স্ত্রী এইটাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসত। বিক্রি করলে পাঁচ ছয় ফ্রাঙ্ক হবে হয়ত। কারণ নকল হলেও এর গঠনে তাৎপর্য্য আছে।

হার পকেটে নিয়ে ম'সিয়ে ল'াতিন মণিকারের দোকানে রওনা হলেন। নিজের দৈন্য প্রকাশ করতে হবে, এমনি একটা অপদার্থ বিক্রি করতে হবে, তাই লজ্জিত সঙ্কুচিত হয়ে এক দোকানে ঢুকে পড়লেন। জহুরীকে ডেকে বললেন: মশাই, বলুনত এর দাম কত হ'তে পারে? লোকটা হার নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল, অন্য একটা লোককে ডেকে চুপি চুপি কি জিজ্ঞাসা করলে, তার পরে গয়নাটা আবার ফিরিয়ে দিলে। ম'সিয়ে ল'াতিন এই দেখে বিরক্ত হ'য়ে বলতে যাচ্ছিলেন: "ও বুঝেছি এর দাম কিছুই নয়।" কিন্তু জহুরী তখনই উত্তর দিল! "এই হারের দাম বার থেকে পনের হাজার ফ্রাঙ্ক হবে। কিন্তু আপনি কোথা থেকে এ পেয়েছেন না বললেত নিতে পারছি না।"

ম'সিয়ে ল'াতিনের চোখ বিস্ফারিত হ'ল, কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন জহুরীর মুখের দিকে। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন।—আপনি জানেন, ঠিক বলছেন কি? জহুরী উত্তর করল: আপনি ইচ্ছা হয় অন্যত্র দেখতে পারেন। যদি কেউ এর চেয়ে বেশী দেয় তাকেই দিবেন।

আমার মনে হয় এর দাম পনের হাজারের বেশী হবেনা। অন্য কোথাও বেশী না পেলে এখানেই আসবেন।

মঁসিয়ে লঁাতিন আশ্চর্য্য হয়ে হারটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তিনি ভাবছিলেন ব্যাপার কি।

বাইরে এসে মনে হ'ল খানিকটা খুব হাসবেন। ইচ্ছা করলে লোকটাকে এখনি প্রচুর ঠকাতে পারতেন। এই লোক জহুরী!

কয়েক মিনিট পরে আর এক দোকানে ঢুকলেন তিনি। দোকানের মালিক হার দেখেই বলে উঠলেন—ও! এ হার ত আমি চিনি। এখান থেকেই কেনা হয়েছিল।

মঁসিয়ে লঁাতিন একটু ব্যগ্রভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন—এর দাম কত?

—হাঁ, বেচেছিলাম আমি বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক দামে। এখন আঠার হাজারে ফিরিয়ে নিতে পারি। কিন্তু এ ব্যবসায়ের আইনানুযায়ী আপনাকে বলতে হবে এ আপনি পেলেন কি করে।

মঁসিয়ে লঁাতিন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লেন। তিনি জহুরীকে বললেন: কিন্তু—কিন্তু আর একবার পরীক্ষা করে দেখবেন কি? এ পর্য্যন্ত আমার ধারণাছিল এটা মেকী।

জহুরী জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার নাম?

—লঁাতিন। মিনিষ্টার অব ইন্টিরিয়র অফিসে কাজ করি আমি।

জহুরী বই খুঁজে দেখলেন, বললেন—হাঁ, হারত ম্যাডাম লঁাতিনের ঠিকানায়ই পাঠানো হয়েছিল।

দুজনেই দুজনকে চেয়ে দেখল, বিপত্নীক বিস্ময়ে নির্ব্বাক, জহুরী মনে করলেন লোকটা চোর। অবশেষে বললেন—আপনি হারটা ২৪ ঘণ্টার জন্য এখানে রেখে যাবেন কি? আমি রসিদ দেব আপনাকে।

মঁসিয়ে লঁাতিন উত্তর করলেন : 'নিশ্চয়ই।' রসিদ পকেটে নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন।

কিছুক্ষণ তিনি পথে পথে নিরুদ্দেশভাবে ঘুরে বেড়ালেন, মন তার ভয়ানক অশান্ত। যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলেন তিনি। পত্নী তার এত দামি গয়না কিছুতেই কিনেনি। এ হ'তেই পারেনা। তাহ'লে এ নিশ্চয়ই উপহার! উপহার, কিন্তু কার কাছে থেকে? কেন দিয়েছে এ তাকে সে?

রাস্তার মধ্যে একবার তিনি দাঁড়ালেন। মনে গভীর সন্দেহ হ'ল, তবে কি স্ত্রী তার—? তাহ'লে স্ত্রীর আর সব গয়নাও উপহার। মনে হ'ল পায়ের নীচে তার পৃথিবী কাঁপছে, সামনের গাছটা পড়ে যাচ্ছে যেন। মূর্চ্ছিত হ'য়ে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। লোকজন ধরাধরি করে এক ফার্ম্মেসীতে নিয়ে এল তাকে। সেখানে তার জ্ঞান হ'ল। তাদের তিনি অনুরোধ করলেন তাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে। বাড়ীতে এসেই একটা ঘরে দরজা বন্ধ করলেন, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পড়ে পড়ে কাঁদলেন। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন জানালার ভিতর দিয়ে দিনের রোদ এসে তার ঘুম ভাঙ্গাল। কিন্তু অফিসে যেতে হবে যে। এত বড় আঘাতের পরে অফিসে গিয়ে আজ কি ক'রে কাজ করবেন তিনি? একটা চিঠি লিখে ছুটী নিলেন। কিন্তু জহুরীর দেকোনেও ত একবার যাওয়া দরকার। এটা তার ভাল লাগলনা, কিন্তু হারটা ওখানে ফেলে রাখাও ত চলেনা। পোষাক পরে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

দিনটা সুন্দর। মাথার উপরে পরিস্কার নীল আকাশ কর্ম্মব্যস্ত সহরের দিকে চেয়ে হাসছে যেন। কর্ম্মহীন লোকগুলি পকেটে হাতদিয়ে এদিক ওদিক ঘুরছে।

তাদের দেখে ম'সিয়ে ল'াতিন মনে মনে ভাবলেন: এ পৃথিবীতে ধনীরাই সুখী। অর্থ গভীরতম দুঃখকে ভুলিয়ে দেয়। হায়। যদি তার অর্থ থাকত!

মনে হ'ল তার ক্ষুধা পেয়েছে কিন্তু পকেট শূন্য। হারের কথা একবার মনে হ'ল পনের হাজার ফ্রাঙ্ক! আঠার হাজার ফ্রাঙ্ক! এত টাকা!

জহুরীর দোকানের সামনে অপর দিকে এসে তিনি দাঁড়ালেন। আঠার হাজার ফ্রাঙ্ক! কতবার ইচ্ছা হ'ল ভিতরে যাবেন কিন্তু লজ্জা এসে বাধা দিচ্ছিল তাকে। কিন্তু বড় ক্ষুধার্ত্ত তিনি, খুবই ক্ষুধার্ত্ত— পকেটে এক কপর্দ্দক নেই। তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে এসে দোকানে ঢুকে পড়লেন যাতে ভাববার সময় না থাকে।

দোকানের মালিক তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এলেন, একখানা চেয়ার এনে দিলেন।

—ম'সিয়ে ল'াতিন, আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি এ হার আপনারই। যদি এখনও এটাকে বিক্রি করতে চান যে দাম বলেছি আমি নিতে পারি।

ম'সিয়ে ল'াতিন অস্পষ্ট স্বরে বললেন—হাঁ, আমি বিক্রি করাই ঠিক করেছি।

জহুরী ড্রয়ার থেকে বার করে আঠার হাজার ফ্রাঙ্ক তার হাতে দিলেন। ম'সিয়ে ল'াতিন একটা রসিদ সই করে দিলেন, কম্পিত হস্তে টাকাগুলি পকেটে রেখে দিলেন।

ম'সিয়ে ল'াতিন দোকান থেকে বাইরে আসছিলেন, জহুরীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার আরও কতগুলি গয়না আছে, একই জায়গা থেকে এসেছে সেগুলি, কিনবেন কি?

জহুরী উত্তর দিলেন : নিশ্চয়ই। নিয়ে আসবেন।

এক ঘণ্টা পরে গয়নাগুলি নিয়ে তিনি ফিরে এলেন।

বড় হীরার ইয়ারিংএর দাম হ'ল বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক, ব্রেসলেট জোড়া পয়ত্রিশ হাজার, আংটিগুলি ষোল হাজার, একসেট নীলকান্ত ও পান্না ষোল হাজার, এক ছড়া সোনার হার হীরার লকেট সহ চল্লিশ হাজার—সবসুদ্ধ এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক।

সেদিন মঁসিয়ে লাঁতিন ভোয়াসিনে এসে ডিনার খেলেন। বিশ ফ্রাঙ্ক ব্যয় হ'ল মদে। একটা গাড়ী ক'রে বাগানে বেড়াতে গেলেন। ইচ্ছা হ'ল চেচিয়ে বলেন, আজ আমি ধনী। দুই লাখ ফ্রাঙ্কের মালিক আমি এখন।

হঠাৎ অফিসের কথা মনে হ'ল। সেখানে গিয়ে জানালেন: চাকরীতে ইস্তাফা দিতে এসেছি আমি। তিনি লক্ষ ফ্রাঙ্কের উত্তরাধিকারী আমি।

পুরাতন কর্ম্মচারীদের তিনি নমস্কার জানালেন। ভবিষ্যতের নানা কল্পনা বললেন তাদের কাছে। তারপরে কেফ অ্যাঙ্গলেতে গিয়ে আহার করলেন। একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের পাশে তিনি বসলেন, খেতে খেতে জানালেন তাকে তিনি আজ চার কোটী ফ্রাঙ্কের মালিক।

জীবনে প্রথম বার তিনি এখন আর থিয়েটারে বিরক্ত হন না। রাত্রির অবশিষ্ট অংশ আমোদ করিয়েই কাটিয়ে দেন।

ছয় মাস পরে আবার তিনি বিয়ে করলেন। দ্বিতীয় পত্নী ধর্ম্মশীলা কিন্তু একটু রুক্ষ। জীবনে লাঁতিনকে এ নিয়ে অনেক দুংখ পেতে হয়েছিল।

অনুশোচনা

মঁসিয়ে স্যাভালকে এই ম্যাণ্টেস অঞ্চলে সবাই "ফাদার স্যাভাল" বলেই জানে। এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেই কি জানি কেন তিনি কাঁদছেন।

শরতের নিরানন্দ দিন, গাছের পাতাগুলি ঝরে পড়ছে। বর্ষণও চলছে সঙ্গে সঙ্গেই কখনও মৃদু, কখনও মুসলধারে। মঁসিয়ে স্যাভেলের মন ভাল নেই। একবার উনুনের কাছ থেকে জানালায়, আবার জানালার কাছ থেকে উনুনের কাছে এই ভাবেই আপন দেহটাকে টেনে চলছেন তিনি। জীবনে দুঃখ আছে। আজ বাষট্টি বছরের মাথায় দাঁড়িয়ে পিছনের সমস্তটুকুই তার দুঃখের স্মৃতি দিয়ে ভরা। তিনি নিঃসঙ্গ একাকী, বৃদ্ধ জীবনে বিয়ে করেননি। আজ হঠাৎ তাকিয়ে দেখছেন চারদিকে কেউ নেই। একাকী মরতে হবে, একেবারে একাকী। কেউ ভাববেনা, কেউ একবার ফিরে তাকাবে না।

বৃদ্ধ একবার পশ্চাতের দিকে তাকালেন—একেবারে নিস্ফল, একেবারে শূন্য সে স্থান। পূর্ব্বস্মৃতি তাঁর মনে পড়ল। বাল্য জীবন, পিতৃগৃহ, ছাত্র জীবন তার আপন নির্ব্বুদ্ধিতা সবই ভেসে উঠল মনের উপর। প্যারিসে তিনি আইন পড়তেন—পিতার অসুস্থতা—তাঁর মৃত্যু—একে একে সবই মনে পড়ল। তার পরেই তিনি মার কাছে ফিরে আসেন। বেশ শান্ত ভাবেই তাদের জীবন চলছিল, কোন কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু মার মৃত্যু হ'ল—জীবনে শুধু দুঃখই আছে। তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি একাকী। আজ নিজেও মৃত্যুর দ্বারে এসে দাড়িয়েছেন। পৃথিবীতে পল স্যাভাল আর

থাকবেনা। কি ভয়ানক! তাকে চলে যেতে হবে, সবই শেষ হবে সেদিন! কি আশ্চর্য্য মৃত্যুদূত মাথার উপর দাঁড়িয়ে তবুও লোকগুলি হাসছে!

হায়! জীবনটা যদি তাঁর পূর্ণ হ'ত! যদি কোন সাহসের কাজ—কোন কৃতিত্ব—কোন সার্থকতা! কিন্তু কই? কিছুইত তাঁর নেই। সমস্ত জীবন কিছুইত করেননি তিনি। এই তাঁর বাষট্টি বছরের জীবন। সবাই বিয়ে করে কিন্তু তিনি তাও করেননি। কিন্তু কেন? হা, কেন তিনি বিয়ে করেননি? এতো তিনি অনায়াসেই করতে পারতেন, এর জন্য অভাব তাঁর কিছুই ত ছিলনা। সুযোগ ঘটেনি। হয়ত তাই হবে। কিন্তু সুযোগও লোকে সৃষ্টি করেই থাকে। তবে তিনি উদাসীন ছিলেন—এই উদাসীনতাই ছিল তার বাঁধা। আপন ঔদাসীন্যের জন্য কত লোকের জীবনই না নষ্ট হয়।

কেউ কোন দিন তাঁকে ভাল বাসেনি। নারীর ভালবাসা এক দিনের জন্যও তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেনি। প্রিয়জনের জন্য অধীর অপেক্ষায় কি আনন্দ, একদিনের জন্যও সে স্বাদ পাননি তিনি। নিজের হাতের মধ্যে একখানা হাত—কি যে স্বর্গীয় আনন্দ, জীবনে আকুল উন্মত্ত আবেগ কি বস্তু আজও জানেন না তিনি।

মঁসিয়ে স্যাভাল আগুনের কাছে বসে। আজ নিশ্চিত বুঝেছেন তিনি জীবন তাঁর ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তিনি নিজে ভালই বেসেছিলেন—গোপনে, উদাসীন ভাবে। হাঁ, বন্ধুপত্নী ম্যাডাম সাণ্ডার্সকে তিনি ভালই বেসেছিলেন। হায়! যদি কুমারী অবস্থায় দেখা হ'ত তার সঙ্গে। তাহ'লে নিশ্চয়ই তিনি তাকে সব খুলে বলতেন।

মনে পড়ল প্রতিবার তিনি যখন দেখেছেন তাকে। অন্তরের সেকি অধীর উন্মত্ততা, কি গভীর দুঃখ বিচ্ছেদে! কত রাত্রি ঘুমোতে পারেন নি

তিনি, সমস্তরাত তারই চিন্তা। ভোরে উঠে দেখেছেন আগের দিনের ক্লান্তি কেটে গেছে, অনেকটা সুস্থ হয়েছেন।

কিন্তু কেন?

সেদিন কি সুন্দরীই না তাকে মনে হ'ত! কেমন সাজগোজ, কি সুন্দর কোকড়ান চুল, হাসি সে মুখে লেগেই আছে। না, স্যাণ্ডার্সের মত লোক তার স্বামী হ'তেই পারেনা। আজ বায়ান্ন বছর তার, মনে হচ্ছে সুখী। হায়! যদি সে তখন তাকে ভালবাসত! কিন্তু কেনই বা সে ভালবাসবেনা? হাঁ, সে স্যাভাল, কত ভালই সে তাকে বাসত। কিন্তু একবার যদি সে একথা বুঝত! কিন্তু কিছুই কি সে বোঝেনি? দেখেনি কিছুই? কিছুই কি তার মনে হয়নি? কিন্তু সেদিন যদি তিনি বলতেন তাকে একথা কি উত্তর সে দিত?

মনে পড়ল স্যাণ্ডার্স গৃহে কত সন্ধ্যাই না তার কেটেছে। কি মনোমুগ্ধকর তার দৃষ্টি! মনে পড়ল কত কথা বলত সে তাঁকে—সেই কণ্ঠস্বর, চোখের হাসি—কোন অর্থই কি তার ছিলনা? মনে পড়ল একসঙ্গে পথ চলা তার সঙ্গে—সিন নদীর ধার দিয়ে তিন জনে কতবার একসঙ্গে চলেছেন। রবিবারে ঘাসের উপর তাদের সেই লাঞ্চ। হঠাৎ মনে পড়ল—একদিন এই নদীতীরে বনের মধ্যে তারই সঙ্গে কেটেছিল একটা অপরাহ্ন।

ভোরের বেলা তারা বেরিয়েছিল, ঝুড়ির মধ্যে ছিল তাদের খাবার। বসন্তের সুন্দর প্রভাত—এমন দিনেই মনের মধ্যে উন্মত্ততা আনে। চারদিকে সবই সুন্দর, সবই শান্ত। পাখীর কণ্ঠস্বর কি মধুর, কি দ্রুত তাদের পক্ষস্পন্দন! উইলো গাছে নীচে জলের ধারে ঘাসের উপর ছিল লাঞ্চের ব্যবস্থা—স্থানটা সূর্য্যকিরণে ঝিলমিল করছিল। বাতাস স্বাস্থ্যকর, সদ্যমুক্তপত্রপুষ্প গন্ধে ভরা। মত্ত আনন্দে প্রকৃতিকে

তারা যেন আকণ্ঠ পান করছিল। প্রকৃতিরাণীর সে কি সুন্দর সাজসজ্জা!

লাঞ্চের পর মঁসিয়ে স্যাণ্ডার্স সেই ঘাসের উপরই শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে অভিভূত হলেন।

দুইজনে তারা চলছিল নদীর পার ধরে—ম্যাডাম সাণ্ডার্স চলছিল—দেহ তার এসে ঝুকে পড়েছিল স্যাভালেরই বাহুর উপর। একটু হেসে ম্যাডাম বলেছিল: আজ আমি মাতাল! একেবারে মাতাল। মঁসিয়ে স্যাভাল তার দিকে একবার ফিরে তাকিয়েছিলেন, বক্ষ তার দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছিল।

জলপদ্মের একটা মালা গেঁথে রমণী তাকে জিজ্ঞাসা করছিল: "আমি কি এরই মত সুন্দর?" তার সে কথার কোন উত্তরই তিনি দেননি তখন, কারণ বলবার মত কিছুই খুঁজে পাননি। কিন্তু মনে হয়েছিল জানু পেতে বসে সমস্ত দেহটাকে লুটিয়ে দিবেন তারই পায়ের কাছে। তার ভাব দেখে রমণী হেসে উঠেছিল, জিজ্ঞাসা করেছিল:—আরে! বলেই ফেলনা কি ব্যথা তোমার! তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল চিৎকার করে কাঁদবেন কিন্তু একটী কথাও খুজে পাননি বলবার মত।

একে একে সব তার মনে হচ্ছিল খুব স্পষ্ট যেন আজি ঘটেছে কেন সে সেদিন জানতে চেয়েছিল, কেন জিজ্ঞাসা করেছিল: "কি ব্যথা তোমার?"

রমণীকে স্যাভাল জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আমাদের কি এখনই ফিরে যাওয়া উচিত নয়? কি অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে রমণী তার দিকে ফিরে চেয়েছিল! মুখে বলেছিল "নিশ্চয়ই" কিন্তু চোখের দৃষ্টি দিয়ে কি কথা সে জানতে চেয়েছিল সেদিন? সেদিন কিন্তু তিনি এমন করে ভেবে দেখেননি কিন্তু আজ যেন সবই একেবারে স্পষ্ট।

রমণী বলেছিল—তোমার যেমন ইচ্ছা। যদি ক্লান্তি এসে থাকে

ফিরে চল। ম'সিয়ে স্যাভাল উত্তর করেছিলেন : না ক্লান্তি হয়নি। কিন্তু স্যাণ্ডার্স হয়ত জেগে উঠেছেন এতক্ষণে। যুবতী উত্তর করেছিল— আমার স্বামীর জেগে উঠবার ভয় হয়ে থাকে ত সে কথা স্বতন্ত্র। চলুন তাহলে ফিরেই যাই।

ফেরার পথে রমণী একটা কথা ও বলেনি, আর সে এসে তার হাত ধরেনি। কিন্তু কেন?

সেদিন কিন্তু এসব তাঁর মনে হয়নি। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেননি "কেন?" আজ মনে হচ্ছে এমন কিছু ঘটেছিল তার অর্থ সেদিন তিনি বুঝতে পারেননি। কিন্তু সেকি হতে পারে? ম'সিয়ে স্যাভালের সমস্ত দেহ লাল হয়ে উঠল, হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তার মনে হল আজও যেন তিনি ত্রিশের কোঠায়, ম্যাডাম স্যাণ্ডার্স তাঁকে বলছে "আমি তোমায় ভালবাসি।"

তা কি সম্ভব? মনের এই চিন্তা কাঁটার মত স্যাভালকে বিঁধতে লাগল। সেকি হ'তে পারে—কিছুই দেখেননি, কিছুই ভাবেননি তিনি? আর যদি একথা সত্য হয়? যদি তিনি তার সুখের মুহূর্তকে ব্যর্থতার মধ্যেই ডুবিয়ে দিয়ে থাকেন— হাতের কাছে পেয়েও যদি সুযোগ গ্রহণ না করে থাকেন!

নিজে নিজে বললেন : আমি জানবো। এই সন্দেহের দোলায় আর আমি দুলতে পারছি না। আমাকে জানতেই হবে। আজ আমার বয়স বাষট্টি, তার বায়ান্ন, একথা জিজ্ঞাসা করলে কিছুই মনে করবেনা। ম'সিয়ে স্যাভাল উঠে পড়লেন। স্যাণ্ডার্স গৃহ রাস্তার অন্য ধারে, তাঁর নিজের বাড়ীর প্রায় সামনাসামনি। তিনি গিয়ে দরজায় আঘাত করলেন। এক ভৃত্য দ্বার খুলে দিল। ভৃত্যের কাছে শুনলেন ম্যাডাম শীতের জন্য নাশপাতি তৈরী করছেন। ম'সিয়ে স্যাভাল তাকে

বললেন: তোমার প্রভু পত্নীকে গিয়ে বল বিশেষ প্রয়োজনে আমি একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ভৃত্য চলে গেল। স্যাভাল কম্পিত পদে সেখানে পাদচারণ করতে লাগলেন। আজ তাঁর কোন দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই—বয়স যে বাষট্টি তাঁর।

দ্বার খুলে ম্যাডাম বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। কি বিশাল বাহু, মোটা একেবারে গোলাকার যেন, দুই গণ্ড থুবড়ে পড়েছে। ব্যগ্রভাবে সে জিজ্ঞাসা করলে: "কি ব্যাপার? কোন অসুখ করেনি ত তোমার?"

—না, কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। বিশেষ দরকারী কথা, না জেনে কিছুতেই আমি সুস্থ হ'তে পারছি না। কিন্তু বল, ঠিক উত্তর দিবে আমাকে?

রমণী হেসে বলল: আমি সব সময়ে ঠিকই বলি। বল কি শুনতে চাও।

—আচ্ছা, প্রথম দিন থেকেই আমি তোমাকে ভালবেসেছিলুম। আজ বিশ্বাস করছ এ কথা? রমণী আবার একটু হেসে উত্তর করলে, যেন সেই বহুদিন পূর্ব্বের কণ্ঠস্বর: কি তোমার ব্যথা প্রথম দিনই বুঝে-ছিলাম আমি।

স্যাভালের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। সে বলতে পারছিলনা ভাল করে:

—তুমি বুঝেছিলে? তাহ'লে......

আর বলতে পারলেন না তিনি। রমণী জিজ্ঞাসা করল: তাহ'লে কি? তিনি উত্তর দিলেন: তাহ'লে? কি তখন ভাবছিলে—আমার ভালবাসা নিতে তুমি সেদিন?

রমণী হেসে উঠল। তার আঙ্গুলের ডগা বেয়ে কয়েক ফোঁটা ফলের রস নীচে কার্পেটের উপর পড়ল।

—আমি? কেন, সেকথা ত তুমি জিজ্ঞাসা করোনি সেদিন। আমি নিজে কেন এগিয়ে গিয়ে বলবো?

স্যাভাল আর একটু এগিয়ে এলেন।

—বল তুমি—আমাকে বল, তাহ'লে সেদিনের কথা তোমার মনে পড়ে? লাঞ্চের পরে স্যাণ্ডার্স ঘাসের উপর ঘুমিয়ে পড়েছিল? বেড়াতে বেড়াতে দুজনে আমরা নদীর মোড় পর্য্যন্ত চলে গেছলাম।

মঁসিয়ে স্যাভাল উত্তরের জন্য অধীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। রমণীর হাসি বন্ধ হল। একবার মুখ তুলে চাইলে তারই চোখের উপর।

—হাঁ খুবই মনে আছে আমার। একেবারে স্পষ্ট।

স্যাভাল জিজ্ঞাসা করলেন, সমস্ত শরীর তার কাঁপছিল—

—আচ্ছা, সেদিন—সেদিন যদি আমার একটু সাহস হ'ত—কি করতে তুমি? রমণী আবার হেসে উঠল—পরিপূর্ণ আনন্দের সে হাসি—অনুশোচনার কিছুই নেই যেন তার। তারপরে একেবারে সুস্পষ্ট স্বরে উত্তর করলে, কিন্তু কণ্ঠস্বর ব্যঙ্গ পূর্ণ!

—হাঁ বন্ধু, কোন আপত্তিই হ'ত না আমার।

ব'লেই মুখ ফিরিয়ে যেমন এসেছিল আবার গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেল।

মঁসিয়ে স্যাভাল আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।—একেবারে হতাশ ভাবে যেন সর্ব্বস্ব হারিয়ে গেছে তাঁর। দ্রুত পদে বৃষ্টিতে ভিজেই নদীর ধারে উপস্থিত হ'লেন। বহুদিন পূর্ব্বে যেখানে একদিন লাঞ্চ হয়েছিল ঠিক সেইখানে পৌছলেন। পত্রহীন গাছের নীচে বসলেন তিনি। দুই চোখ তার অশ্রুপূর্ণ, তিনি কাঁদছিলেন।

বিদায়

বন্ধুদ্বয়ের আহার শেষ হ'য়ে এসেছিল। হোটেলের জানালা দিয়ে বাইরের জনপূর্ণ রাস্তা চোখে পড়ে। গ্রীষ্মকালে অপরাহ্নে প্যারিসের মৃদু বায়ুস্পর্শ অনুভব করছিল তারা। মৃদুমন্দ এই বাতাস মনে করিয়ে দেয় কোথায় যেন চলেছে, স্বপ্ন আনে চন্দ্রালোকে বিধৌত স্রোতস্বিনীর, মনে পড়ে জোনাকীপোকা, চাতক পাখীর কথা।

বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন হেনরী সাইমন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন: আ! বুড়ো হয়ে যাচ্ছি! কি দুঃখের কথা! আগে আগে এমনি সন্ধ্যায় কি স্ফুর্ত্তি মনে হ'ত আমার! জীবন ক্ষণকালের।

সাইমনের বয়স পয়তাল্লিশ, মাথায় টাক বেশ বড়, বেশ মোটা সোটা সে।

অন্য ব্যক্তি পিটার কর্ণিএ আরও একটু বুড়ো, অপেক্ষাকৃত কৃশ কিন্তু প্রফুল্ল। সে উত্তর করল:

আমি বুড়ো হয়েছি তবুও কিন্তু একথা ভাবিনি কখনো। সর্ব্বদা প্রফুল্ল ছিলাম, আনন্দিত ছিলাম, শরীরে মনে জোর ছিল। আর্শিতে প্রতিদিন মুখ দেখে যারা বয়সের এই ধর্ম্ম তাদের চোখে পড়েনা। এত ধীরে, একটু একটু করে চেহারা বদলে যায় যে এই পরিবর্ত্তন চোখেই লাগেনা। একে বুঝতে হলে ছয় মাস নিজের মুখ না দেখে থাকতে হবে, তারপরে সে কি নির্ম্মম আঘাত!

আর এই নারীজাতি—দয়া হয় আমার এদের দেখে, বন্ধু। সমস্ত আনন্দ, সকল প্রভুত্ব, সমস্ত জীবন তাদের এই সৌন্দর্য্যে কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের জীবন মোটে দশবছর।

এখন যা বলছিলাম।

আমি বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিনি এ। মনে হ'ত আমি যুবক কিন্তু তখন বয়স আমার পঞ্চাশ। কখনো দুর্ব্বলতা অনুভব করিনি, শান্তিতে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতাম সর্ব্বত্র।

জীবন আমার দিন দিন ক্ষয় হচ্ছে এ বুঝলাম আমি কত সহজে এবং কি ভয়ানক ভাবে! ছয়মাস অভিভূত ছিলাম, তারপরে আত্মসমর্পণ করলাম এই পরিনতির নিকট।

আর সবাইর মতো আমিও প্রেমে পড়েছি, বিশেষ করে একবার।

বছর বার আগে যুদ্ধের একটু পরেই Etretatএ তাকে আমি প্রথম দেখি সমুদ্রোপকূলে। প্রাতঃকালে স্নানের সময়ে কি সুন্দর এই উপকূল। বেশ ছোট, ঘোড়ার খুরের আকার, চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা, মাঝে মাঝে ফাঁক সমুদ্র পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। উচু পাহাড়ের মধ্যে সঙ্কীর্ণ একস্থানে রমণীরা একত্র হয়, দেখে মনে হয় যেন গাউনের উদ্যান। উপকূলে সূর্য্যরশ্মি পড়ে, বহু রঞ্জিত ছাতাগুলি ঝলমল করে, নীল সমুদ্রজলে সে উজ্জ্বলতা প্রতিফলিত হয়। চারদিক প্রফুল্ল, যেন হাসছে। জলের ধারে বসে দেখবে স্নানার্থীদের স্নানের পোষাক পরে রমণীরা নামছে, শ্বেত ফেনাচ্ছাদিত ঢেউএর পিছনে ছুটছে তারা।

খুব কম রমণীই এই স্নানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হ'তে পারে, এখানেই সত্যিকার বিচার হয় তাদের গোড়ালি থেকে কণ্ঠ পর্য্যন্ত। জল থেকে উঠবার সময়েই দোষগুলি তাদের ধরা পড়ে।

রমণীকে জলের মধ্যেই আমি দেখলাম, কি আনন্দ আমার, আমি মুগ্ধ হ'লাম। এক একখানা মুখ আছে, যা একবার দেখেই মন আনন্দে ভরে উঠে। মনে হয় একেই ভালবাসার জন্য জন্মেছি। আমি পেয়েছিলাম সেই আঘাত এবং সেই অনুভূতি।

পরিচয় হ'ল, আরও অভিভূত হ'লাম। হৃদয় আমার একান্তভাবে তাকেই চাইত। কি ভয়ানক অথচ কি আনন্দ এইভাবে চালিত হওয়া! সে এক অসহ্য যন্ত্রণা কিন্তু অসীম আনন্দ আবার। সেই দৃষ্টি, সেই হাসি, বায়ুভরে উড়ছে সেই চুলের রাশি, তার মুখশ্রী, তার গতিভঙ্গী আমাকে আনন্দ দিত, অভিভূত করত, মুগ্ধ করত। তার গাউন দেখে মনে হ'ত এর তুলনা নেই, এ টুপীর মত টুপী কোথাও নেই।

সে বিবাহিত। স্বামী তার শনিবার আসে, সোমবার চলে যায়। তার সম্বন্ধে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য ছিলনা। তাকে আমি ঈর্ষ্যা করিনি কখনো। জীবনে যদি আমার সব চেয়ে কম দৃষ্টি কেউ আকর্ষণ করে থাকে তবে সে এই ব্যক্তি।

কিন্তু এই রমণী! কত ভালবাসতাম তাকে! কেমন সুন্দরী, কি মনোহারী লাবণ্য! সে যৌবন, সে সৌন্দর্য্য, সে সরসতা! জীবনে এমন করে আর কখনো ভেবে দেখিনি সুন্দরী, সুতনু, মনোহারী রমণী কি বস্তু। ভেবে দেখিনি কখনো গণ্ডের কারুকার্য্যে, ওষ্ঠের ভঙ্গীতে, কানের রক্তাভায়, আর এই নির্ব্বোধ নাকের আকৃতিতে এত আকর্ষণ থাকতে পারে।

তিনমাস এমনি চলেছিল। তারপরে আমেরিকা চলে গেলাম দুঃখ নিয়ে। কিন্তু স্মৃতি তার একদিনের জন্যও ভুলিনি আমি। বছরের পর বছর কেটে গেল, সে কিন্তু সেদিন যেমনি ছিল তেমনি রয়ে গেল। সেই দেহলাবণ্য সর্ব্বদাই ছিল আমার দৃষ্টির সুমুখে। ভালবাসা আমার একদিনের জন্যও তার প্রতি বিশ্বস্ততা নষ্ট করেনি।

বারবছর একটা জীবনের পক্ষে কিছুই নয়। চলে যেতে এ কেউ অনুভব করেনা। বছরগুলি ধীরে ধীরে একটা আর একটাকে অনুসরণ

করে, কিন্তু তার পরেই সব শেষ হয়ে যায়। দ্রুতগতিতে চলে যায় এগুলি, পিছনে দাগ রাখেনা। সম্পূর্ণভাবে অতীত হয়, পশ্চাতে অতীতের দিকে যখন ফিরে তাকায় কিছু দেখতে পায়না, বুঝতে পারেনা এই এই বার্দ্ধক্য এল কি করে। মনে হ'ল আমার Etretat এ সমুদ্রোপকূলে আমার যে জীবন তা থেকে এ কয়েক মাসের ব্যবধান।

গত মাসে মেসে°। লাফিতে গেছলাম কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে।

গাড়ী ছাড়ছে, এমনি সময়ে বিশাল স্ফীতদেহ এক মহিলা ভিতরে প্রবেশ করলেন সঙ্গে চারটী মেয়ে। এই গোলাকার মহিলামুরগীর দিকে আমি চেয়ে দেখিনি একবারও। রমণী থেকে থেকে ফুলছিল, দ্রুত ছুটে আসতে গিয়ে হাপাচ্ছিল। শিশুগুলি কিলকিল করছিল। আমি কাগজটা ভাঁজ করে পড়তে আরম্ভ করলাম।

আমনিয়ের ছেড়ে এসেছি, এই সময়ে নিকটবর্ত্তিনী আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন: মাপ করবেন, মশাই। আপনি কি ম°সিয়ে গারনিএ নন?

—হাঁ ম্যাডাম।

তারপরেই সে হাসতে লাগল, একটা শান্ত হাসি কিন্তু দুঃখপূর্ণ।

—আপনি বোধ হয় চিনতে পারেননি আমাকে।

আমি দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়লাম, মনে হ'ল তাকে দেখেছি কোথাও কিন্তু কোথায়? কখন?

উত্তর করলাম—হাঁ, আপনাকে চিনি কিন্তু মনে করতে পারছিনে।

রমনী লজ্জিত হ'ল।—ম্যাডাম জুলিয়ে লেফেভর আমি।

আর কখনো এমন আঘাত পাইনি। এক মুহূর্ত্ত মনে হ'ল আমার

সমস্ত শেষ হয়েছে। মনে হ'ল আমার সুমুখ থেকে একটা আবরণ উঠে গেছে—কি ভয়ানক, হৃদয়বিদারক! কি আবিষ্কার!

এই সেই! এই বিরাটবপু স্ফীতদেহ রমনী সেই! আমার চলে যাওয়ার পরে সে এই চারটী মেয়ের মা হয়েছে! এই ক্ষুদ্র জীবনগুলিও আমাকে কম বিস্মিত করেনি। এরাও তারই অংশ। বেশ বড় মেয়ে এরা, সংসারে এদের স্থান আছে কিন্তু তাকে আজ আর চিনবেনা কেউ সেই মানামুগ্ধকর সৌন্দর্য্য! মনে হ'ল যেন মাত্র কাল তাকে দেখেছিলাম আজ এই দেখছি। এ কি সম্ভব? অন্তরে দুঃসহ দুঃখ হ'ল, স্বভাবের বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহী হ'ল সংসারের উপর কেন এই দুরন্ত ধ্বংসলীলা।

কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হ'য়ে একবার চেয়ে দেখলাম তাকে। তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিলাম, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। আমি কাঁদলাম তারই বিগত যৌবন স্মরণ করে। এই স্ফীতদেহ রমনীকে যে চিনিনা আমি।

রমণী নিজেও উত্তেজিত হ'ল, ক্ষীণ স্বরে বলল:

"খুব পরিবর্ত্তন হয়েছে আমার? তাই নয়? কি আর আশা করতে পারেন, বলুন। সকলেরই সময় আছে। দেখছেন, মা হয়েছি আমি যেমন সাধারণ মা'রা হয়ে থাকেন। আর সবই শেষ হয়ে গেছে আমার। আমিও মনে করিনি চিনবেন আমাকে। আপনারও পরিবর্ত্তন হয়েছে। বেশ সময় নিয়েছে বুঝতে আমার ভুল হচ্ছে কিনা। আপনার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। ভেবে দেখুন বার বছর আগে! বার বছর! আমার বড় মেয়ের বয়স এখন দশ।

মেয়েটার দিকে চেয়ে দেখলাম। মনে হ'ল তার মুখে যেন মা'র সৌন্দর্য্য দেখছি কিন্তু এখনও অসম্পূর্ণ, ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ হবে হয়ত। মনে হ'ল জীবনটা যেন গতিশীল ট্রেন।

মৈসোলাফিতে পৌছলাম। পুরাতন বন্ধুকে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। খুব সাধারণ কথা হ'ল, কথা বলার শক্তি ছিলনা আমার।

রাত্রিতে একাকী আর্শির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়ালাম, নিজেকে ভাল করে দেখলাম। মনে পড়ল কি ছিলাম, মনের চোখ দিয়ে দেখলাম আমার সেই কটা গোঁপ, কালো চুল, মুখের সেই যৌবনশ্রী, আজ আমি বৃদ্ধ, বিদায় মাগছি সংসারের কাছে।



শিশু

মৃত পত্নীর একমাত্র চিহ্ন এক শিশুসন্তানসহ লিমোনিএ আর দ্বিতীয় বার বিয়ে করেননি। পত্নীকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। লোকে বলত সে ভালবাসা ছিল অগাধ, অতুলনীয়। বিবাহিত জীবনে একদিনের জন্যও তারা ভালবাসার অভাব বোধ করেনি। লিমোনিএ সহজ সরল এবং সৎলোক।

যৌবনে প্রতিবেশীর এক দরিদ্র কন্যাকে তিনি ভালবেসে ফেলেন এবং তাকেই বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে আবেদন তাঁর অগ্রাহ্য হয়নি। কাপড়ের ব্যবসা থেকে উপার্জ্জন তার একেবারে মন্দ ছিলনা।

স্ত্রীর ভালবাসা তাঁকে সুখী করেছিল। সমস্ত দিনরাত্রি চিন্তাছিল এই স্ত্রী, মিনতিভরা দৃষ্টি নিয়ে সমস্তক্ষণ তিনি তারই দিকে চেয়ে থাকতেন। একমুহূর্ত্তের জন্য সেমুখের উপর থেকে দৃষ্টি তাঁর ফিরতনা, এরজন্য কত ভুল হ'ত খেতে খেতেও। থালার উপর ঢালতেন মদ, নুনের পাত্রে ঢালতেন জল, তারপরে শিশুর মতোই হেসে উঠতেন।

—দেখেছ কত ভালবাসি তোমাকে এরই জন্যইত আমি কেমন যেন হয়ে গেছি।

পত্নী তার দিকে চেয়ে শান্তভাবে হাসত, তারপরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিত, স্বামীর এই উপাসনার ভাব তাকে অপ্রতিভ করত যেন। সে অন্য কথা পাড়তে চেষ্টা করত কিন্তু স্বামী তার অন্য কোন কথাই শুনবেন না যে। পত্নীর হাতখানা আপন হাতের মধ্যে নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকতেন :

"জেনি, প্রিয় জেনি আমার।"

স্বামীর ব্যবহারে পত্নী সময়ে সময়ে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলত। বলত:

—আঃ একটু শান্ত হওনা। তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি সব গেলো কোথায়? এখন যাও, আর আমাকে দুটী খেতে দাও।

লিমোনিএর অন্তর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত। বড় একটুকরা রুটি ছিঁড়ে মুখে পুড়ে তাকে চিবোতে থাকতেন।

পাঁচ বছর তাদের কোন সন্তান হয়নি। তারপরে হঠাৎ একদিন স্ত্রীর কাছে শুনলেন নূতন কথা। লিমোনিএর আনন্দ আর ধরেনা। স্ত্রীকে ছেড়ে এক মিনিটের জন্যও তিনি কোথাও নড়েন না।

মঁসিয়ে ডুরেতোর লিমোনিএর অন্তরঙ্গ বন্ধু। লিমোনিএর পত্নীর সঙ্গেও তার পরিচয় শৈশব থেকেই। সপ্তাহে প্রায় তিনদিন থাকত তার লিমুনিএ গৃহে নিমন্ত্রণ। লিমোনিএ পত্নীকে কখনো এনে উপহার দিতেন রাশি রাশি ফুল, কখনো নিয়ে যেতেন থিয়েটারে বক্স ভাড়া করে। ডিনারের পরে টেবিলের ধারে বসে কখনো কখনো লিমনিএ বন্ধুর প্রশংসায় উচ্ছসিত হয়ে উঠতেন। পত্নীর দিকে ফিরে বলতেন: "তোমার মত সঙ্গী, আর ওর মতো বন্ধু যার, পৃথিবীতে সুখী হতে তার আর কি চাই?"

সূতিকাগারে পত্নীর মৃত্যু হয়। এই নিদারুণ আঘাত তাঁকে মৃতপ্রায় করেছিল। কিন্তু সদ্যজাত শিশুর কোমলকান্তি দেখে তিনি ধৈর্য্য ধরেছেন।

শিশুকে তিনি একান্তভাবেই ভালবাসতেন। এই ভালবাসার একদিকে ফুটে উঠত মত্ততা, অন্যদিকে আবার তেমনি ছিল বিমর্ষতা, এরই ভিতর দিয়ে তিনি করতেন স্ত্রীর স্মৃতির উপাসনা। এই শিশু—তার পত্নীরই রক্তমাংস সে—তার কাছ থেকেই ও এসেছে,—যুগ যুগ ধরে তারই বার্তা বয়ে যাবে ওর ভিতর দিয়ে। পত্নীই হয়ত আজ অই

শিশুরূপে তার কাছে এসেছে। সে চলে গেছে তারই সমস্ত নিয়ে ও হয়ত বেঁচে থাকবে। ভাবতে ভাবতে পিতা চুম্বনে শিশুর সমস্ত শরীর ভরে দিতেন। কিন্তু তখনই মনে হ'ত এই শিশুই ত তাকে মেরে ফেলেছে; তারই জীবনকে নিয়ে ও এসেছে যে। শিশুকে দোলনায় বসিয়ে লিমোনিএ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত, কত স্বপ্ন তিনি দেখতেন—কত মধুরতা, কত সুখ-দুঃখের তাঁর স্মৃতি। শিশু ঘুমিয়ে পড়ত, লিমোনিএর সমস্ত শরীর তারই উপর ঝুঁকে পড়ত, দুই চোখ বেয়ে অশ্রুরাশি গড়িয়ে পড়ত।

ছেলে একটু বড় হ'ল। তাকে ছেড়ে পিতার অন্যকোথাও যাবার জো নেই। তার কাছে থাকতে হবে, তাকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন, নিজহাতে তাকে পোষাক পরিয়ে দেবেন, ধুইয়ে মুছিয়ে দিবেন, খাইয়ে দিবেন। বন্ধু ডুরেতোরও শিশুকে খুব ভালবাসে। পিতামাতার আবেগ নিয়েই সে শিশুর সমস্ত দেহকে চুম্বনে ভরে দেয়, তাকে কোলের কাছে টেনে নেয়। বন্ধুর ব্যবহারে আনন্দিত হয়ে লিমনিএ বলেন, —দেখেছ কি সুন্দর! সুন্দর নয় কি?

একমাত্র বৃদ্ধা ধাত্রী সিলেস্তই যেন শিশুর উপর বিরূপ। শিশুর আবদারে বৃদ্ধা উগ্র হয়ে উঠে, শিশুকে নিয়ে এই দুই ব্যক্তির আদর আহ্লাদ সে কোনমতেই সইতে পারেনা। সময়ে সময়ে সে তাদের বলে—"এমনি করে কি তোমরা শিশুকে বড় ক'রে তুলতে চাও? তোমরা তাকে একটা আস্ত বাঁদর করবে দেখছি।"

কয়েক বছর অতীত হয়েছে। জনের বয়স এখন নয় বছর। লেখা পড়া সে প্রায় কিছু জানে না। সে আদুরে সন্তান, নিজের যা ইচ্ছা তাই করে। সে নাছোড়বান্দা, কাকেও মানে না। পিতা সর্ব্বদাই

তার পক্ষে, মঁসিয়ে ভুরেতোর সর্ব্বদাই তাকে খেলনা কিনে দেয়। ব্যবহার দেখে সিলেস্ত রেগে উঠে, চীৎকার করে সে বলে—

—কি করছ তোমরা? ছেলেটার সর্ব্বনাশ করছ যে। এভাবে আর চলবেনা, চলবেনা বলছি, আর বেশীদিন এভাবে চলবেনা।

লিমোনিএ হেসে উত্তর করতেন: "কি চাও তুমি? বলছি ওকে আমি ভালবাসি। ওর কোন কিছুই আমি না করতে পারি না। এ তোমাকে মেনে নিতেই হবে।"

জন দুর্ব্বল। ডাক্তার বলেছেন তার শরীরে রক্ত কম, খাদ্যে লোহা, মাংস এবং ব্রথ প্রয়োজন। কিন্তু শিশু কেবলমাত্র কেক ভালবাসে, আর কিছুই খাবেনা সে। তাই পিতাও কেক ও চকোলেট দিয়েই তার পেট ভরছেন।

বিকালবেলা একদিন সবাই খেতে বসেছে। সিলেস্ত একবাটী স্যুপ নিয়ে এল। সেদিনকার মূর্ত্তিটা তার যেন একটু বেশী উগ্র। অবস্থা বুঝে ভীত হয়ে লিমোনিএ মাথা নত করলেন। বুঝলেন এখনি ঝড় উঠবে।

বাটিটা জনের সামনে ধরতেই ঘ্রাণ নিয়ে একটু দূরে ঠেলে দিলে। কিন্তু সিলেস্ত জোর করে এক চামচে তার মুখে ঢেলে দিল।

কিন্তু বালক কিছুতেই খাবেনা তা। হাঁচিতে, থুথুতে সমস্ত একখানা ক'রে তুলল সে। চীৎকার করে বাটিটা সে সিলেস্তএর দিকে ছুড়ে মারলে। সিলেস্ত এবারে আর ধৈর্য্য রাখতে পারলেনা। বিরক্ত হয়ে বালকের মাথাটা কোলের মধ্যে চেপে ধ'রে চামচের পর চামচে তার মুখে ঢেলে দিতে লাগল। বালকের সমস্ত শরীর বিটের মত রাঙা হয়ে উঠল। হাত পা ছুড়ে, চীৎকার করে সে হাঁপিয়ে পড়ল।

লিমোনিএ প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়ে গেছলেন, কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে

পারেন নি। কিন্তু পরে রেগে এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধাকে গলা ধরেএকেবারে দেয়ালের গায়ে ফেলে দিলেন।

—দূর হ! দূর হ! জানোয়ার কোথাকার।

কিন্তু ধাত্রী সিলেস্তও তাকে দূরে ধাক্কা দিয়ে দিল। চুলগুলি তার পিঠের উপর এলিয়ে পড়েছিল। চীৎকার ক'রে সে বললে:

—কিসে পেয়েছে তোমাকে? আমাকে ধাক্কা মারছ, ছেলেকে খাওয়াচ্ছি কিনা তাই। আর মিষ্টি দিয়ে তুমি তার পেট ভরবে!

লিমোনিএ তবুও বলছিলেন: "দূর হ! দূর হ! জানোয়ার! মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপছিল।

বারবার কথাশুনে ধাত্রীও তার দিকে ফিরে দাঁড়াল, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে—কণ্ঠস্বর তার ঈষৎ কম্পিত:—"কি! এমনি ব্যবহার করবে তুমি আমার সঙ্গে? না, তা হবে না, আর নয়। কিছুতেই হবে না এ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কার জন্য, কিসের জন্য করছ এসব? একটা হতচ্ছাড়া ছেলে, আর সে ছেলেও তোমার নয়। না, ঠিক বলছি, তোমার নয়। একথা সবাই জানে। জিজ্ঞাসা করো গিয়ে মুদীকে, রুটিওয়ালাকে, মাংসওয়ালাকে সবাই বলবে একথা।

লিমোনিএ নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, কে জানে ধাত্রীর কথা তিনি শুনেছেন কিনা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ অনুচ্চ—কি বলছ তুমি? কি বলছ?

সিলেস্ত আর কোন উত্তর করল না। লিমোনিএর চেহারা দেখে ভয় হ'ল তার। লিমোনিএ আর একটু এগিয়ে এলেন, জিজ্ঞাসা করলেন: কি বলছিলে, বল? ধাত্রী তখন শান্ত ভাবে উত্তর করলে: আমি যা জানি, তাই বলছি। সবাই জানে একথা।

লিমোনিএ সজোরে বৃদ্ধার হাতখানা চেপে ধরলেন, তার চোখে,

মুখে হিংস্র জানোয়ারের তীব্র দৃষ্টি কিন্তু বুড়ো হলেও সিলেস্তের গায়ে শক্তি ছিল। হাত ছাড়িয়ে সে টেবিলের ওধারে ছুটে গেল, চীৎকার করে বললে: একবার ওর দিকেই চেয়ে দেখনা, চেয়ে দেখ অই ছেলের মুখের দিকে। কি বোকা তুমি! দেখছনা অই মুখখানা তুরে তোরের। একবার অই চোখ আর অই নাকের দিকে তাকাও দেখি। ওকি তোমার চোখ? একবার অই চুলগুলি দেখো। কার অইগুলি আমি বলছি সবাই জানে, কেবল তুমিই জানো না। সমস্ত সহরে এ একটা হাসির ব্যাপার। একবার চেয়ে দেখো ভালকরে—

দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে বৃদ্ধা বেরিয়ে গেল। জন নীরব ভাবে বসেছিল।

প্রায় একঘণ্টা পরে ধাত্রী ফিরে এল, দেখবে সে কি ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। জন ততক্ষণে সমস্ত কেক এবং এক হাঁড়ি ক্রিম শেষ করেছে। এবারে একখানা চামচে ও সিরাপের এবং জ্যাম পাত্র নিয়ে বসেছে। পিতা বাইরে গেছেন।

বালককে তুলে নিয়ে সিলেস্ত চুমো খেল। তাকে নিয়ে ধীরে ধীরে বিছানায় শুইয়ে দিলে। খাবার ঘরে এসে সেখানটা পরিষ্কার করলে কিন্তু মন থেকে অস্বস্তি তার কিছুতেই ঘুচল না।

ঘরে সাড়াশব্দ নেই। প্রভুর দ্বারের কাছে এসে সে কান পেতে রইল, কিন্তু মনে হ'ল সমস্তই নীরব। ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখল—কি যেন লিখছেন, যেন মনে তার কোন উদ্বেগ নেই।

সিলেস্ত রান্নাঘরে ফিরে এসে বসল, প্রতীক্ষায় রইল প্রভু এসে কি বলবেন। কিন্তু চেয়ারের উপর ঘুমিয়েই সমস্ত রাত কেটে গেল তার।

ভোরে উঠে দিনের কাজে সে লেগে গেল। ঘর ধোয়ার পরে ৮টার সময় লিমোনিএর ব্রেকফাষ্ট তৈরী হ'ল। কিন্তু কি ক'রে তাঁর সামনে

যাবে সে? কি বলবে সে তাকে দেখে? সে অপেক্ষা করে রইল লিমোনিএ নিজেই তাকে ডাকবেন। কিন্তু কই নটা বাজে, দশটা চলে গেল।

কি করবে ভেবে না পেয়ে সিলেস্ত ট্রে সাজিয়ে উঠে পড়ল। হৃদয় তার দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছিল।

দরজার কাছ এসে সে কাণ পেতে রইল, তারপরে কড়া নাড়ল। কিন্তু কোন সাড়া নেই, কেন? সাহস করে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। একটা বিকট চীৎকার করে হাতের ট্রেটা মাটিতে ফেলে দিলে। ঘরের মধ্যখানে ছাদের সঙ্গে দড়ি দিয়ে লিমোনিএ ঝুলছে। জিহ্বাটা মুখের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে গেছে। ডানপায়ের চটিটা মাটিতে পড়ে, বা পায়েরটা এখনও পায়ের সঙ্গে লেগে আছে। একটা চেয়ার বিছানার উপর উল্টে পড়ে।

সিলেস্ত চীৎকার ক'রে বাইরে বেরিয়ে এল। প্রতিবেশী সবাই এসে একত্র হ'ল। ডাক্তার বললেন মধ্যরাত্রে তার মৃত্যু হয়েছে।

ডুরেতোরকে লেখা একখানা চিঠি পাওয়া গেল টেবিলের উপর। লেখা আছে তাতে—

ছেলেকে তোমার হাতে দিলাম।

লিমোনিএ

রোজালা প্রিদাঁ

আসল ব্যাপারটা কি তা না বুঝছে জুরী, না বুঝছেন প্রেসিডেণ্ট, না বুঝছেন পাবলিক প্রোসিকিউটর।

কুমারী প্রিদাঁ নাস্তে সহরে ভ্যারাম্বো গৃহের পরিচারিকা। গৃহস্বামীর অজ্ঞাতে সে গর্ভবতী হয়। রাত্রিতে প্রসবের পরে শিশুকে বাগানে পুতে ফেলে—এই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ।

কুমারী পরিচারিকাদের নিয়ে এমন ঘটনা আরও অনেক ঘটেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে একটু নূতনত্ব আছে। প্রিদাঁর কক্ষ তালাস করতে গিয়ে পুলিস একটা শিশুর সম্পূর্ণ তৈরী পোষাক পেয়েছে, রোজাল্যার নিজ হাতেই তৈরী। গত তিন মাস ধরে রাত্রির অধিকাংশ সে এই কাজেই ব্যয় করেছে। নিজের সামান্য বেতন থেকে অর্থ বাঁচিয়ে মুদীর দোকান থেকে সে মোমবাতি কিনেছে এজন্য। মুদী নিজেই বলে গেছে একথা। তা ছাড়া এ অঞ্চলের ধাত্রীকেও রোজাল্যা সব কথা জানিয়েছিল। ঠিক সময়ে তার সাহায্য পাওয়া না গেলে কি করবে একথাও সে জিজ্ঞাসা করেছিল তার কাছে। সন্তানসহ বালিকাকে তার বর্ত্তমান প্রভু রাখবেনা এজন্য Poissyতে তার জন্য একটা কাজ সংগ্রহ করে রাখবার জন্য ধাত্রীকে সে অনুরোধ করেছিল। ধাত্রী সে কাজ সংগ্রহ করে রেখেছে।

ভারাম্বো দম্পতিও বিচারগৃহে উপস্থিত। পরিচারিকা বালিকা তাদের গৃহের মর্য্যাদা নষ্ট করেছে, এ তারা কোন মতেই সহ্য করবে না। তাদের মতে এসব মেয়েদের বিনা বিচারেই গিলোটিন হওয়া উচিত।

অপরাধী বালিকা সুন্দরী, লোয়ার নর্মাণ্ডীতে তার ঘর, নিজের

কাজের পক্ষে সে খুবই শিক্ষিত। আদালতে দাঁড়িয়ে সে অনবরতই কাঁদছে, মুখে কোন কথা নেই, কোন প্রশ্নেরই উত্তর নেই।

আদালত এবং দর্শকেরা সবাই স্থির করেছিল হতাশায় উন্মত্ত হয়েই সে এ অপকার্য্য করেছে। কারণ সন্তানকে সে রক্ষা করতে চেয়েছিল, এ সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নেই।

প্রেসিডেণ্ট স্থির করলেন শেষ বার চেষ্টা করে দেখবেন, তাকে দিয়ে অপরাধ স্বীকার করে নিবেন। যথাসম্ভব ভদ্র এবং শান্তভাবে তিনি বুঝিয়ে বললেন, বিচার করতে আদালতে যারা বসে অপরাধীর তারা মৃত্যুই চায়না, প্রয়োজন বুঝলে তারা তাকে দয়াও করতে পারে।

কথা শুনে রোজালা বললে সব কথা খুলে বলবে সে। প্রেসিডেণ্ট বললেন, তাহ'লে বল এই সন্তানের পিতা কে।

এর আগে রোজালা একটী কথাও বলেনি তার সম্বন্ধে।

ভারাম্বো দম্পতি তখনও তাকে তিরস্কার করছিল, তাদের দিকে দিকে চেয়েই সে উত্তর করলে: "সন্তানের পিতা মঁসিয়ে ভারাম্বোর ভাইপো জোসেফ।"

কথা শুনে দুজনেই কেঁপে উঠল, সমস্বরে চীৎকার ক'রে বললে: "মিথ্যাকথা, মিথ্যাবাদী এ কখনই হতে পারেনা।"

প্রেসিডেণ্ট তাদের ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন, রোজালাকে বললেন: বলে যাও তুমি। কি ঘটেছিল, কেমন ক'রে ঘটেছিল বলে যাও।

হঠাৎ রোজালার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার হল, তার বিব্রতভাব কেটে গেল। এক হতভাগ্য নারী তার ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত গোপন ব্যথাকে প্রকাশ করতে উন্মত্ত হ'ল।

—হাঁ, মঁসিয়ে জোসেফ ভারাম্বো, গত বছর সে যখন এসেছিল এখানে।

—জোসেফ ভারাম্বো কি করেন?

—সৈন্যদলে তিনি একজন ননকমিশনড অফিসার। দুইমাস এখানে ছিলেন তিনি, গত গ্রীষ্মের দুমাস। সর্ব্বদাই আমার দিকে চেয়ে থাকতেন তিনি, আমাকে প্রশংসা করতেন, কয়েকদিন পরে ভালবাসা জানালেন। তার কথায় ভুলে গেলাম আমি। তিনি বলতেন আমি সুন্দরী,—তারই উপযুক্ত সঙ্গী। আর আমি? আমারও ভালই লাগত তাকে। কি করব আমি? সংসারে আমি একাকী, একেবারে একাকী, মন খুলে কথা বলবার কেউ নেই, দুঃখ জানাবার কেউ নেই। একদিন সন্ধ্যাবেলা বললে তার সঙ্গে নদীর ধারে যেতে, দুজনে কথা বলব। আমি চলে গেলাম,—জানিনা কি ক'রে আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল। তার বাহু ছিল আমাকে জড়িয়ে—না, না, সত্যি বলছি আমি, সেদিন চাইনি আমি এ, কিছুতেই চাইনি। মনে হ'ল চীৎকার ক'রে কাঁদি—চারদিকের বাতাস ছিল হাল্কা, আকাশে চাঁদ ছিল। না, না আমি পারিনি—শপথ ক'রে বলছি শক্তি ছিলনা আমার। তিন সপ্তাহ এমনি চলেছিল, যতদিন সে ছিল। মনে হ'ত তার সঙ্গে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যেতে পারি আমি। কিন্তু সে চলে গেল। জানতাম না তখন আমি গর্ভবতী, তারপরে এক মাসের আগে বুঝিনি একথা।

রোজালার কান্নার বেগ উচ্ছসিত হ'য়ে উঠল। আদালত সময় দিল সামলে নিতে। বিচারক স্নেহ পূর্ণ কণ্ঠে বললেন—বল এবারে। সে বলতে আরম্ভ করল:

"নিজের অবস্থা বুঝে আমি ম্যাডাম বুদিনের কাছে চলে গেলাম, অই যে ওখানে দাঁড়িয়ে তিনি। সবই জানেন তিনি। তাকে

জিজ্ঞাসা করলাম প্রসবকালে তিনি উপস্থিত না থাকলে কি করব আমি। এই পোষাক আমি নিজেই তৈরী করেছি, রাতের পর রাত জেগে সেলাই করেছি এ। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে রাত একটা পর্য্যন্ত কাজ করেছি। আমি জানতাম এরা আমাকে তাড়িয়ে দিবে, তাই আর একটা কাজ ঠিক করে রেখেছিলাম। শেষ দিন পর্য্যন্ত এ বাড়িতেই থাকতে চেয়েছিলাম। প্রত্যেকটী পেনি আমি বাঁচিয়ে রাখতাম। কারন দরিদ্র হ'লেও শিশুকে বাঁচাতে হবেত!

— তাহ'লে তুমি তাকে মেরে ফেলতে চাওনি?

—না, না চাইনি আমি।

—তবে মেরে ফেললে কেন?

—বলছি সে কথা। এত শীগগির হবে আশা করিনি। আমি ছিলাম রান্নাঘরে। মঁসিয়ে এবং ম্যাডাম ভারাম্বো দুজনেই তখন ঘুমিয়েছেন। তাই উপরে যেতে আমার অসুবিধা হ'লনা। আমি মেজের উপর শুয়ে পড়লাম! কি অসহ্য ব্যথা! কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানিনা—হয়ত এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা কিংবা তিন ঘণ্টা হবে। তারপরে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলেছিলাম আমি—মনে হ'ল কিছু বাইরে এল। তাকে আমি তুলে নিলাম।

সত্যি বলছি আমি—মনে হ'ল আমি সুখী, আমার আনন্দের সীমা নেই আজ। ম্যাডাম বুদিন যা যা বলেছিল সবই করলাম। শিশুকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। কিন্তু তারপরেই আবার ব্যথা। অসহ্য ব্যথা, মনে হ'ল বাঁচবোনা আমি। হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসলাম কিন্তু তারপরেই পড়ে গেলাম। আবার—আবার আর একটী—ঠিক একই রকমের। বিছানায় তুলে নিলাম তাকেও, দুটীকে শুইয়ে দিলাম একেবারে পাশাপাশি। এখন বল কি করব আমি এ দুটীকে নিয়ে?

বিশটী ফ্রাঙ্ক মোট মাসিক আয় যার কি করবে সে ? বল একি সম্ভব ? নিজে না খেয়ে কোন মতে একটীকে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে কিন্তু এ যে দুটী ! আমার মাথা ঘুরে গেল। কি করব আমি ? আমার উপায় কি ?

কি আমি করি ? মনে হ'ল এ যেন শেষ মুহূর্ত্ত আমার। কেন জানিনা কিছু না বুঝেই দিলাম তাদের উপর বালিশ চাপিয়ে। কি করে রাখব দুটীকে ? ঝাপিয়ে পড়লাম তাদের উপরে। তারপরে বিছানায় এপাশ আর ওপাশ—কান্নায় বুক ফেটে যাচ্ছিল আমার। দিনের আলোর স্বর্ণরেখা জানালা দিয়ে ভিতরে এসে পড়ছিল। বালিশ তুলে দেখলাম নীচে দুটীই শেষ হয়েছে। কোলে তুলে নিয়ে গেলাম বাগানে। মালির কোদাল নিয়ে যতদূর সম্ভব গর্ত্ত করে শুইয়ে দিলাম তাদের—দুটীকে এক জায়গায় নয়—একটী এখানে, একটী ওখানে—পাছে একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মাকে নিয়ে—অভিশাপ দেয় তাকে।

বিছানায় এসে শুইয়ে পড়লাম, মনে হ'ল অসুস্থ আমি, বিছানা ছেড়ে উঠবার সাধ্য হ'লনা। ডাক্তার ডেকে পাঠান হ'ল, সবই বুঝল সে। সবই ব'লেছি, এবারে যা অভিপ্রায় করতে পারেন। আমি প্রস্তুত।"

জুরীরা কেউ তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলনা। আদালতে উপস্থিত মেয়েরা সব কাঁদছিল। প্রেসিডেণ্ট জিজ্ঞাসা করলেন—"আর একটীকে কোথায় রেখেছ ?"

—এইটীকে কোথা থেকে আনা হয়েছে।

—এটী পাওয়া গেছে থিসেল গাছের নীচে।

—তাহ'লে অন্যটী আছে ষ্ট্রবেরী গাছের তলে।

কান্নায় সে ভেঙ্গে পড়ল, বিচার গৃহে সবার চোখে জল।

রোজালা বিচারে মুক্তি পেল।

কৌশল

বৃদ্ধ ডাক্তার আগুনের কাছে বসেছিলেন। সোফায় অর্দ্ধশায়িতা সুন্দরী রোগিনীর সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। রোগ বিশেষ কিছুই নয়—সামান্য রক্তহীনতা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা সুন্দরী রমণীদের পক্ষে এসব খুবই সাধারণ।

রমণী বলছিল—"না, ডাক্তার আমি বুঝতেই পারছিনা স্ত্রীলোক কি করে স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসী হয়। তাকে না ভালবাসতে পারে, নিজের শপথ বা প্রতিজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকতে পারে কিন্তু অন্য একজনের নিকট কি ক'রে নিজেকে সে সমর্পন করে? কি ক'রে —কি ক'রে অন্য লোকের চোখে ধূলা দেয় সে? মিথ্যা এবং বিশ্বাস-ঘাতকতার মধ্যে কি করে সে ভালবাসতে পারে?

ডাক্তার একটু হেসে বললেন: আপনার এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। আমি বলতে পারি স্ত্রীলোকের মাথায় যখন বিপথে যাবার দুর্বুদ্ধি চাপে তখন এতসব সে চিন্তাই করে না। আর শঠতা এবং প্রতারণার কথা বলছেন—সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই এ আছে। শুনে আশ্চর্য্য হবেন মেয়েদের মধ্যে যারা সব চেয়ে বোকা, নিজেদের আসন্ন সঙ্কট থেকে বাঁচাবার যথেষ্ট বুদ্ধি তাদেরও আছে।

মনে হ'ল যুবতী কিছুতেই বিশ্বাস করছেনা এসব। সে বলল: না, ডাক্তার সঙ্কটে পড়বার আগে কেউ ভেবে রাখেনা কি করে উদ্ধার পাবে। পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই এসব ক্ষেত্রে বেশী বুদ্ধিহারা হয়।

ডাক্তার তাঁর হাত তুললেন, বললেন: কি বলছেন? ঘটবার পরে? আচ্ছা আমার এক রোগিনীর কথা বলছি আপনাকে। মনে করিনি কোনদিনই কোন দোষ তাকে স্পর্শ করতে পারে।

মফস্বলের এক ছোট সহরে ঘটেছিল এ ঘটনা। একদিন রাত্রে আমি ঘুমিয়ে আছি, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম এ সময়ে জাগা খুবই কষ্টকর। ঘুমের ঘোরে মনে হ'ল আমি স্বপ্ন দেখছি সহরের ঘণ্টা বেজে উঠে অগ্নি সঙ্কেত করছে। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। দেখলাম আমার নিজেরই দরজার ঘণ্টা। ভীষণভাবেই বাজছিল ঘণ্টা। চাকরটা দরজা খুলছে না দেখে মাথার কাছে ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিলাম। একটু পরেই দরজা খুলবার শব্দ পেলাম, নীরবগৃহে পায়ের শব্দ শোনা গেল। জিন গৃহে প্রবেশ করে আমার হাতে একটা চিঠি দিল। চিঠিতে লেখা—"ম্যাডাম লেলিভর ডাক্তার সাইমনকে অনুরোধ জানাচ্ছেন, এখনই যেন একবার আসেন তিনি দয়া করে।"

একটু চিন্তা করলাম, নিজে নিজে বললাম—"সামান্য স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হবে। একটু পরেই সেরে যাবে। আর খুবই ক্লান্ত আমি!" উত্তর দিলাম—"ডাক্তার সাইমনের শরীর ভাল নেই। ম্যাডাম লেলিভর যেন দয়া করে তার সহকারী মঁসিয়ে বনেকে ডাকেন।"

চিঠিটা খামেপুরে চাকরের হাতে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। একটু ঘুমিয়ে ছিলাম, প্রায় আধঘণ্টা পরে বাইরের ঘণ্টা আবার বেজে উঠল। জিন এসে জানাল—নীচে কে এসেছেন, বুঝতে পারেনি পুরুষ কি মেয়ে—আপাদ মস্তক আবৃত তার—আমার সঙ্গে এখনই কথা বলতে চান। আগন্তুক বলছে তার কাছে এ জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন। বিছানার উপরে উঠে বসলাম, জিনকে বললাম তাকে আসতে বল।

একটা ভূতের মতো কালো চেহারা ভিতরে প্রবেশ করল। জিন চলে যেতেই আগন্তুক আবরণটা তুলে ফেলল তার। দেখলাম ম্যাডাম বার্থে লেলিভর—যুবতী রমণী। তিন বছর আগে সহরের এক বিখ্যাত ধনী

বণিকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার। সবাই বলে রমণী এ অঞ্চলে সব চেয়ে সুন্দরী।

দেখলাম—চেহারা তার বিবর্ণ, মুখশ্রী উন্মাদের মুখের ন্যায় কুচকে গেছে, হাত দুটা ভয়ানকভাবে কাঁপছে। রমণী দুইবার কি বলবার চেষ্টা করল কিন্তু কোন কথাই বেরোলনা মুখ থেকে তার। একটু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে ফেলল—আসুন, আসুন। একটু তাড়াতাড়ি করে চলুন ডাক্তার। একবার আসুন—এইমাত্র মরেছে সে, আমার শয়ন ঘরে। রমণী থামল, উচ্ছ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল তার। তারপরে বলতে লাগল—আমার স্বামী এখনই এসে পড়বেন ক্লাব থেকে, তাড়াতাড়ি চলুন একবার।

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলাম। একবার ভাববার সময় হ'লনা শোবার পরিচ্ছদ প'রে আছি আমি। মুহূর্ত্তের মধ্যে বেশ করে নিলাম, রমণীকে জিজ্ঞাসা করলাম—"একটু আগে আপনিই এসেছিলেন কি?" রমণী উত্তর করল—"না, আমার চাকরাণীটা এসেছিল, সে জানে সব।" ভয়ে ভীত রমণী প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললে, "আমি ওখানেই ছিলাম তারই পাশে।" এই সময়ে রমণী একটা চীৎকার করে উঠল, যেন বিভীষিকা দেখছে। একবার তার কণ্ঠরোধ হ'ল, তারপরে হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁদতে লাগল। সে কি ভয়ানক কান্না! প্রায় দুই মিনিট ধরে তার এই কান্নার রোল চলল। হঠাৎ চোখের জল বন্ধ হ'ল তার—কিন্তু মনে হ'ল অন্তরে যেন আগুন জ্বলছে। তবুও একান্ত, বিষাদভরা শান্তভাবে সে বললে—"ডাক্তার, একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।"

আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম, বললাম—গাড়ী ঠিক করে আনতে বলতে ভুলে গেছি যে। রমণী বললে গাড়ী আমার আছে। তারই

এ গাড়ী, তাকেই নিয়ে যাবার জন্য দাঁড়িয়েছিল। রমণী আবার নিজের সর্ব্বশরীর আবৃত করল, এমন কি মুখখানা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলল। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

গাড়ীতে এক সঙ্গে যেতে যেতে আমার হাতখানা ধরে ফেলে বললে, তার কণ্ঠস্বর কম্পিত—এ যেন ব্যাকুল হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা। "কি কষ্ট আমার যদি জানতেন! যদি জানতেন আপনি! তাকে আমি ভালবাসতাম. কি ব্যাকুলভাবে ভালবাসতাম তাকে! গত ছয় মাস ধরে আমি পাগলের মত ভালবেসেছি তাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম— "আপনার ঘরে আর কেউ আছে কি?"

—"না, এক রোজ ছাড়া আর কেউ নেই, আর সবই জানে সে।"

আমরা এসে দরজার কাছে দাঁড়ালাম, সবাই তখন ঘুমে। গুপ্ত চাবি দিয়ে রমণী দরজা খুলে ফেলল, পা টিপে টিপে আমরা উপরে উঠলাম। ভীত পরিচারিকা একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে সিঁড়ির কাছে বসেছিল। মৃতব্যক্তির সঙ্গে এক কক্ষে নির্জ্জনে ভয় হচ্ছিল তার। আমি কক্ষে ঢুকলাম, দেখলাম সবই বিশৃঙ্খল। একটা ভিজে গামছা দিয়ে যুবকের কপালটা ভিজিয়ে দিচ্ছিল, দেখলাম সেটা মেজের উপর পড়ে আছে, কাছেই রয়েছে একটা ওয়াশ ব্যাসিন আর একটা গ্লাস। উগ্র ভিনেগারের গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরপূর।

মৃত ব্যক্তির দেহটা সটান পড়ে ঘরের মাঝখানে। আমি নিকটে গেলাম, দেখলাম, স্পর্শ করলাম। চোখ দুটা খুলে দেখলাম, নাড়ী অনুভব করলাম. তারপরে রমণীর দিকে ফিরে বললাম—দেখলাম সে কাঁপছে—"একটু ধরুন দেখি, একবার বিছানায় শুইয়ে দিই।"

বিছানায় রেখে ধীরে ধীরে বক্ষস্পন্দন অনুভব করলাম, মুখের কাছে

একটা আর্শি ধরলাম, কিন্তু দেখলাম সবই শেষ হয়ে গেছে। তাদের বললাম সেকথা। সে এক ভয়ানক দৃশ্য!

একবার লোকটার দিকে চেয়ে দেখলাম তারপরে বললাম—"চুলটা একটু ঠিক করে দিবেন কি?" পরিচারিকা উঠে গিয়ে প্রভুপত্নীর ব্রাস ও চিরুণী নিয়ে এল। দেখলাম হাত তার কাঁপছে, ঠিক করতে গিয়ে লম্বা লম্বা কোঁকড়ান চুলগুলি বারবার টেনে বার করছে। ম্যাডাম লেলিভর এই দেখে তার হাত থেকে চিরুণীটা নিজেই নিলে, এমন সুবিন্যস্তভাবে কেশ বিন্যাস করতে লাগলো, দেখে মনে হ'ল যেন আদর করছে তাকে। চুলটাকে নিয়ে সে দুইভাগ করল, দাঁড়িটাকে সে ব্রাস করে দিল, আঙ্গুলের আগায় গোঁপটাকে নিয়ে পাকিয়ে দিল। তারপরে হঠাৎ চুল ছেড়ে দিয়ে মৃতব্যক্তির মাথাটা দুইহাতের মধ্যে নিয়ে হতাশভাবে বহুক্ষণ একদৃষ্টে মুখের দিকে চেয়ে রইল। আজ আর এ মুখ হাসছে না তাকে দেখে। রমণী হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ল তার বুকের উপর, দুই হাত দিয়ে বুকের কাছে টেনে নিল তাকে, তারপর উন্মত্তভাবে চুম্বন করতে লাগল। মনে হ'ল তার প্রত্যেকটী চুম্বন যেন মৃতের মুখ, চোখ, গণ্ড এবং কপোলের উপর এক একটী আঘাত। ওষ্ঠ দুটী কানের কাছে নিলে যেন চুপি চুপি বলবে কিছু। মর্ম্মন্তুদ করুনস্বরে বার বার বলতে লাগল—বিদায়! বন্ধু!

এই সময়ে ঘড়িতে বারটা বাজল, আমি চমকে উঠলাম। চিৎকার করে উঠলাম—বারটা? ক্লাব বন্ধ হয় এই সময়ে। আসুন ম্যাডাম, আর আমাদের এক মুহূর্ত্ত নষ্ট করা উচিত নয়।"

রমণী চমকে উঠল। আমি বললাম—একে এখন ড্রয়িংরুমে নিয়ে যাওয়া দরকার। সেখানে নিয়ে একটা সোফার উপর তাকে শুইয়ে

দিলাম, মোমবাতিগুলি জেলে দিলাম। ঠিক এই সময়ে সামনের দরজা খুলল, এবং শব্দ করে বন্ধ হ'ল।

—"রোজ, আমাকে বেসিনটা আর তোয়ালেটা এনে দাও, আর ঘরটা একটু ময়লা করে রাখ। দোহাই, একটু তাড়াতাড়ি কর। মঁসিয়ে লেলিভর আসছেন।"

সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনলাম, দেয়ালের গায়ে তার হাত দেখা গেল।—"এই যে, আসুন। এক দুর্ঘটনা ঘটেছে এখানে।"

বিস্মিত গৃহস্বামী দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন, তার মুখে একটা সিগার। জিজ্ঞাসা করলেন—কি, ব্যাপার কি? এসবের অর্থ কি?" একটু নিকটে গিয়ে আমি বললাম—দেখছেন কি? এক বিপদে পড়েছি আমি। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছিলাম। আমি আর আমার এই বন্ধু। বন্ধু তার গাড়ীতে আমাকে নিয়ে এসেছিল। কথা বলতে বলতে একটু দেরী করে ফেলেছিলাম কিন্তু এরই মধ্যে বন্ধু মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। কত চেষ্টা করলাম কিন্তু এই দুইঘণ্টা ধরে তার মূর্চ্ছা আর ভাঙছেনা। অপরিচিত লোককে ডাকিনি। আপনি একটু সাহায্য করলে একে নীচে নিয়ে যেতে পারি। শুশ্রূষা এর নিজ বাড়ীতে গিয়েই ভাল হবে।

গৃহস্বামী বিস্মিত হয়েছিলেন কিন্তু সন্দেহ করেননি কিছুই। টুপীটা খুলে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি কোলে তুলে নিলেন। ভবিষ্যতের জন্য সে একান্ত নিরীহ আজ। আমরা নীচে নামলাম, ম্যাডাম লেলিভর আলো ধরে পথ দেখাচ্ছিল। বাইরে গিয়ে আমি দেহটার কাছে দাঁড়ালাম গাড়ীচালক যেন বুঝতে না পারে কিছু। চীৎকার করে বললাম—"এস বন্ধু, কিছু নয়। এখন একটু ভাল লাগছে, না? এস, একটু সাহস কর দেখি, উঠে পড়।" মনে হ'ল আমার হাতের মধ্য দিয়ে সে পড়ে যাচ্ছে। তার কাঁধের উপর একটা চড় কশালাম এগিয়ে

গিয়ে সে গাড়ীর মধ্যে পড়ল। পিছনে পিছনে আমিও গাড়ীতে উঠলাম। মঁসিয়ে লেলিভর ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিছু সিরিয়স মনে করেন কি? আমি হেসে উত্তর করলাম—"না।" পত্নীর মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম স্বামীর হাতের মধ্যে তার হাত, ঝুঁকে পড়ে সে গাড়ীর ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করছে।

তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চালককে বললাম গাড়ী চালাতে। মৃতদেহ গাড়ীর মধ্যে কেবলই ঢলে পড়ছিল। বাড়ীতে পৌছে আমি বললাম পথে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে। ধরাধরি করে উপরে তুললাম, সেখানে গিয়ে জানালাম সে মরে গেছে। শোকার্ত্ত পরিবারের সে আর এক দৃশ্য। ডাক্তার চুপ করলেন কিন্তু তখনও হাসছিলেন তিনি। যুবতী রমণী খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সে বলল এই ভয়ানক গল্প আপনি কেন বললেন? একটা নমস্কার জানিয়ে ডাক্তার উত্তর করলেন—গল্প বলেছি তার কারণ যদি প্রয়োজন হয় আপনারও সাহায্য করতে পারি।



আবিষ্কার

জাহাজখানি যাত্রীতে ভরা, মনে হ'ল ভ্রমণটা এবার বেশ আনন্দদায়ক হবে। আমি চলছিলাম হাভার থেকে ক্রভিলে।

জাহাজের দড়ি তোলা হ'ল, শেষবারের মত বাঁশী বাজল, জাহাজখানি দুলতে দুলতে চলল। উপর থেকে নামছিলাম, দেখলাম স্থানটা লোকের মাথায় মাথায় কালো হয়ে গেছে। যাত্রীর দল যারা ইতিমধ্যেই পৌছে গেছে রুমাল উড়িয়ে বিদায় নিচ্ছিল যেন আমেরিকা চলেছে, উপরে বন্ধুরাও প্রত্যভিবাদন জানাচ্ছিলেন অনুরূপভাবেই।

জুলাই মাস। প্রচণ্ড সূর্য্য রশ্মি ছড়াচ্ছে সমাগত রমণীদের ছাতার উপর, মন্দ্রাদোলিত তাদের বস্ত্রের উপর। সূর্য্যকিরণে প্রফুল্লিত মুখগুলি হাসছে, ছায়া পড়েছে সাগরের বুকে। সমুদ্র নীরব শান্ত, বিন্দুমাত্র আন্দোলন নেই। বন্দর ছেড়ে জাহাজ চলেছিল সম্মুখের দিকে, দূরে পরপার প্রত্যূষের কুয়াসার মধ্য দিয়ে ঝাপসা মনে হচ্ছিল। আমাদের বাদিকে সিন নদীর মুখ; নদীর জল কর্দ্দমাক্ত, মাঝখানে হলদে রেখা সমুদ্রের জল থেকে ভাগ করে রেখেছে তাকে।

ডেকযাত্রীদের মধ্য দিয়ে পথ করে চলছিলাম, হঠাৎ শুনলাম পিছনে কে ডাকছে। ফিরে তাকালাম, দেখলাম বন্ধু হেনরী সিডিয়ন। দশ বছর পরে এই তার সঙ্গে দেখা। করমর্দ্দনের পরে আমরা হাটতে লাগলাম দুজনেই একসঙ্গে, নানা কথা বলছিলাম। সিডিয়ন যাত্রীর ভিড় দেখছিল, হঠাৎ বলে উঠল, কণ্ঠস্বরে তার উত্তেজনা ও বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল: কি নচ্ছার! সমস্ত জাহাজখানা দেখছি ইংরেজ জাতিতে ভরা!"

সত্যিই তাই। লোকগুলি এখানে ওখানে দাঁড়িয়েছিল, গর্ব্বিত-ভাবে সমুদ্রের দিকে চেয়ে ছিল। যেন বলছিল—দেখ আমাদের—আমরা ইংরেজ, সমুদ্রের উপর রাজত্ব করি আমরা।

শ্রীহীন কিশোরীর দল সমুদ্রের সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের পানে চেয়ে নিরুদ্দেশের হাসি হাসছিল, দেহ তাদের বহু রং রঞ্জিত শালে আবৃত, দীর্ঘ দেহের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাথাগুলি সুদৃঢ় ইংরেজ টুপীতে ঢাকা।

বৃদ্ধা রমণীর দল আরও কৃশ, স্বভাবসিদ্ধ মুখব্যাদনে তাদের লম্বা লম্বা দাঁতগুলি যেন ভয় দেখাচ্ছিল সবাইকে।

সিডিয়ন আবার বললে, এবারে সে যেন আরও রেগে গেছে :—

"কি নচ্ছার! আচ্ছা, এদের কি ফ্রান্সে আসা বন্ধ করা যায় না?"

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম তাকে—"কেন? ওদের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ কি? আমার কথা বলতে গেলে আমি ত কোন কারণ দেখিনা।"

উত্তেজিত ভাবে বন্ধু উত্তর করল—"না, তা দেখবে কেন? তুমি ত আর ওদের কাউকে বিয়ে করোনি। সেটা আমিই করেছিলাম।"

একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, আমাকে সব খুলেই বলনা। তোমাকে কি সে খুবই অসুখী করছিল?"

একটু ভেবে বন্ধু বললে—"না, ঠিক তা নয়।"

—তবে—তবে কি সে তোমার সঙ্গে কোন অবিশ্বাসের কাজ করেছিল?

—দুর্ভাগ্য আমার, আমার বিশ্বাস সে হারায়নি কখনো। নইলে ডাইভোর্স হ'ত, তাকে ত্যাগ করলাম।

—তাহ'লে ব্যাপার কি? কিছুই বুঝছি না যে!

—বুঝছনা। তা এ না বোঝাটা তোমার আশ্চর্য্যও নয়। কথাটা এই যে সে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে শিখেছিল। তবে শোন।

ছ'বছর আগে যখন Etretat যাই গ্রীষ্মকালটা সেখানে কাটাব বলে, আমার বিয়ে করবার ইচ্ছা ছিলনা মোটেই। এই সব জলো জায়গার মতো ভয়ানক স্থান আর নেই। তুমি বুঝতে পারছোনা কুমারী মেয়েদের পক্ষে এই সব স্থান কেমন কাজে লাগে। প্যারিস বিবাহিত রমণীদের স্থান আর এগুলো জায়গা হ'ল কিশোরীদের।

গাধাচড়া, তরঙ্গস্নান, ঘাসের উপর প্রাতরাশ এ সমস্ত কিছু বিবাহযোগ্য পুরুষদের জন্য ফাঁদ ছাড়া আর কিছু নয়। আর সত্যি কথা বলতে—আঠার বছরের এক কিশোরী মাঠের মধ্যে ছুটবে, অথবা রাস্তার পাশে ফুল কুড়িয়ে বেড়াবে, এর চেয়ে সুন্দর আর কি হ'তে পারে?

এক ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। যে হোটেলে আমি ছিলাম সেখানেই থাকত তারা। এই যে লোকগুলি দেখছ গৃহকর্তা ওদেরই মতো দেখতে আর কর্ত্রীও অন্যান্য ইংরেজ রমণীদের মতোই।

দুই ছেলে তাদের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বল ব্যাট এবং র‍্যাকেট নিয়ে খেলে বেড়াত তারা। দুই মেয়ে বড়টী রুক্ষ, শুকিয়ে যাওয়া ইংরেজ রমণীদের মতো কিন্তু ছোটটী যেন সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন, অপার্থিব সৃষ্টি। এমন হ'লে কিছু বলা কঠিন হ'তে তার তারা স্বর্গীয়। যার কথা বলছি আমি চোখ দুটী নীল—এ নীল রং এ যেন আছে পৃথিবীর সমস্ত

কবিতা, সমস্ত স্বপ্ন, পৃথিবীর সমস্ত আশা, সমস্ত শান্তি। অই দুটী চোখ—কত অপরূপ স্বপ্ন সৃষ্টি করে তারা, হৃদয়ের কত অস্ফুট চিরন্তন প্রশ্নের তারা উত্তর।

আর একটা কথা, আমরা ফরাসী জাতি। বিদেশী রমণীদের একটু শ্রদ্ধার চোখেই আমরা দেখে থাকি। কোন এক রাসিয়ান, ইতালীয়ান, স্পেনিশ, সুইডিশ বা ইংরেজ রমণীকে আমরা একবার দেখি, অমনি তখনই তাকে ভালবেসে ফেলি। বিদেশী যা কিছু তাই আমাদের চোখে বেশী ভাল লাগে—বিদেশী বস্ত্র, বিদেশী টুপী, বিদেশী বন্দুক এমন কি বিদেশী রমণী পর্য্যন্ত—কিন্তু কত বড় ভুল!

আমার মনে হয় বিদেশী রমণীদের যা আমাদের মুগ্ধ করে সে তাদের উচ্চারণ ভঙ্গী। যখনই কোন রমণী যা তা ভাবে আমদের ভাষা উচ্চারণ করে আমরা ভাবি কি সুন্দর! যদি ভুল শব্দ ব্যবহার করে ভাবি তার মতো সুন্দরী আর নেই, আর যদি অনর্গল অস্পষ্ট উচ্চারণে বিব্রত করে তুলতে পারে তাকে একান্তই চাই আমাদের।

কেটী এমন ভাষা বলত যে শুনে তুমি আশ্চর্য্য হবে। প্রথমতঃ কিছুই বুঝতে পারিনি আমি, কত নূতন শব্দ সে তৈরী করেছিল! আমি ভয়ানক নিবিড়ভাবে ভালবেসে ফেললাম এই অদ্ভুত হাস্যজনক ভাষাকে। ভাঙ্গাভাঙ্গা অদ্ভুত কথাগুলি শুনলেই হাসি পায়। কি সুন্দর শোনাত তার মুখে! প্রতি সন্ধ্যায় ক্যাসিনোর ছাদে বসে বসে কত কথা হত আমাদের মনে হ'ত সবই যেন হেঁয়ালি।

আমি বিয়ে করলাম, উন্মাদ হ'লাম ভালবেসে, এ যেন স্বপ্নের ভালবাসা আমার। কারণ যথার্থ প্রেমিক যারা তারা স্বপ্নকেই ভালবেসে থাকে, ভালবাসাই রমণী মূর্ত্তি নিয়ে আসে।

তাই বলছি তোমাকে, কি বোকামিই করেছিলাম তাকে এক

ফরাসী শিক্ষক রেখে দিয়ে। জীবনে এ আমার সব চেয়ে বড় ভুল। যতদিন সে অভিধানকে বলি দিয়েছে, ব্যাকরণের উপর অবাধ অত্যাচার চালিয়েছে আমি শ্রদ্ধা করতাম তাকে। কথাবার্ত্তায় আমাদের জটিলতা ছিলনা মোটেই। মনে হ'ত কি সুন্দর, কেমন মনোমুগ্ধকর সে! তাকে দেখে মনে হ'ত সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট খেলনার কথা, দড়ি টানবে আর তারা বলবে "বাবা, মা।"

স্বীকার করি সে কথা বলে বিশ্রী ভাবে, খুবই বিশ্রী, অসংখ্য ভুল করে কিন্তু তবুও আমি বুঝতে পারি তাকে। কিন্তু আমার পুতুলকে আমি খুলে ফেললাম—ভিতরটা দেখব বলে। আমি তা দেখলাম। কিন্তু এখন কি ভাবে কথা বলি তার সঙ্গে?

জানোনা তুমি শিক্ষিতা ইংরেজ রমণীদের মতামত, তাদের আদর্শ আমি যেমন জানি। কিছুতেই দোষ দিতে পারিনি তাকে। সকাল থেকে সন্ধা পর্য্যন্ত কেবল কথার পর কথা French Reader থেকে। ইংলণ্ডে এর সাহায্যে ইংরেজ রমণীরা ফ্রেঞ্চ শিখে থাকে।

দেখেছ তুমি সে সব গিল্টিকরা কাগজ স্বাদহীন মিশ্রিগুলি জড়ান থাকে যা দিয়ে? তারই একটী আমি পেয়েছিলাম। কাগজখানা ছিড়ে ফেললাম খাব বলে। কিন্তু ভিতর দেখে সমস্ত মন ভরে উঠল বিতৃষ্ণায়। এদের দেখে তাই মন আমার বিষিয়ে উঠছে আজও।

একটা তোতাকে আমি ভাল বেসেছিলাম, বুঝলেত?

দূরে ত্রুভিল বন্দরের জেটী দেখা যাচ্ছিল জন পূর্ণ। আমি বললাম —"তোমার স্ত্রী এখন কোথায়?"

সে উত্তর করলে —

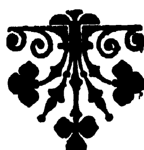
আমি তাকে Epernay এ রেখে এসেছি আবার।

—আর তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ ?

—আমি ? আমি এখন ক্রভিলেই থাকব।

তারপরে একটু থেমে সে বললে—

—তুমি বুঝতে পারবেনা সময়ে সময়ে স্ত্রীলোক কত বোকা হতে পারে।



বিধবা

গল্পটি বলা হয়েছিল বেনভিলের দুর্গে বসে। সে বছরের শিকার আরম্ভ হয়ে গেছে তখন। শরৎকাল, বর্ষা হচ্ছিল, দিনটা ভারী বিষণ্ন। লাল লাল শুক্‌না পাতাগুলি আর পায়ের নীচে খস্‌খস্‌ করেনা, মুসলধারে বারিবর্ষণে পচে গেছল সেগুলি।

বনভূমি ভিজা—যতদূর হতে পারে। কাঁচা আঙ্গুরের মদের গন্ধ আসছিল এ থেকে, তার সঙ্গে মিশেছিল বৃষ্টির গন্ধ, পচা ঘাসের গন্ধ এবং ভিজা মাটির গন্ধ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় শিকারের দল ফিরে আসত—প্রবল বারিবর্ষণে পিঠ তাদের নুয়ে পড়েছে, কুকুরগুলি বিমর্ষ—লেজ সোজা হয়ে দুই পায়ের নীচে ঝুলে পড়েছে, লোমগুলি দুই পাশে গায়ের সঙ্গে লেগে গেছে। রমণীদের সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে, দেহে মনে তারা ক্লান্ত।

আহারের পরে ড্রইংরুমে সবাই মিলে লোটো খেলত, আমোদ জমত না, বাইরে বাতাস উন্মত্তভাবে গৃহের চারিদিকে ঘুরে বেড়াত। বইএ যে যা গল্প পড়েছে তাই দিয়ে আসর জমাবার চেষ্টা করত সবাই, কিন্তু মন গুলিকে প্রফুল্ল রাখার মত কেউই কিছুই বলতে পারত না। শিকারীরা গল্প বলত অদ্ভুত গোলাগুলির, খরগোস হত্যার কিন্তু গল্প জমছিল না কিছুতেই। এক যুবতী রমণী এক অনূঢ়া বৃদ্ধার হাতখানা নিয়ে সোহাগভরে নাড়াচাড়া করছিল, হঠাৎ চোখে পড়ল আঙ্গুলে একগোছা সুন্দর চুলের একটা আংটী। এর আগেও এ সে দেখেছে কিন্তু তেমন মনোযোগ দেয় নাই।

আস্তে আস্তে আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করল সে, তারপরে জিজ্ঞাসা

করলে—মাসী, এ আংটিটা কিসের? মনে হচ্ছে কোন বালকের চুল দিয়ে এ তৈরী।

বৃদ্ধা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল যেন, মুখ তার কালো হ'য়ে গেল। কম্পিত স্বরে বলল—অত্যন্ত দুঃখের কথা এ, তাই সে কথা আমি বলতে চাইনা। আমার জীবনের সমস্ত দুঃখ এ থেকে। আমি খুবই ছোট তখন, কিন্তু স্মৃতি তার এমন ভাবেই আমার অন্তরে গাঁথা হ'য়ে আছে যে যত বারই আমি সে কথা মনে করি—আমি কাঁদি।

সবাই ধরল গল্পটা তাদের বলতেই হবে, কিন্তু বৃদ্ধা বলবে না কিছুতেই। অবশেষে অনেক অনুরোধের পরে সে সম্মত হ'ল। গল্পটা এই :

অনেক সময়েই তোমরা আমার মুখে স্যাণ্টেজ পরিবারের কথা শুনেছ। আজ আর তাদের কারও চিহ্নমাত্র নাই। এই পরিবারের শেষ তিনজন পুরুষকে আমি জানতাম, একই ভাবে তাদের সবার মৃত্যু হয়েছে; এই চুল শেষটার। তার বয়স তখন তের। এই বয়সেই আমারই জন্য প্রাণ দিয়েছে সে। তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছ, নয় কি?

ও! কি অদ্ভুত পরিবার—তোমরা বলবে পাগল কিন্তু মন প্রাণ মুগ্ধ করে এই পাগলামি—ভালবাসার এ পাগলামি। পিতা থেকে পুত্র পর্য্যন্ত সবার অন্তর বাহির উন্মত্ত আবেগে পরিপূর্ণ, জ্ঞানশূন্য। তাদের কত বেপরোয়া কাজ করতে প্ররোচিত করত, এ অবস্থায় যে কোন ভয়ানক অন্যায় পর্য্যন্ত করতে পারত তারা। এ তাদের অন্তরে জন্মাত, প্রবল অনুরাগ কোন কোন লোকের অন্তরে যেমন আপনা থেকেই জন্মে। একটা কথা আছে: স্যাণ্টেজদের মতই অনুরাগী। তাদের একজনকে একবার দেখলেই এ বোঝা যেত। তরঙ্গায়িত চুল ছিল

তাদের, ভ্রূ পর্য্যন্ত নেমে আসত সেগুলি, সঙ্কুচিত শ্মশ্রু, বড় বড় চোখ দৃষ্টি তার মানুষের অন্তর পর্য্যন্ত ভেদ করে প্রবেশ করত—কেন তা কেউ জানত না।

এই চুল যার তার পিতা যিনি অনেক দুঃসাহসের কাজ, অনেক দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, অনেক নারীহরণের সঙ্গে তার নাম জড়িত। পয়ষট্টি বৎসর বয়সে তিনি এক কৃষকের কন্যার প্রেমে উন্মত্ত হন। তাদের দু'জনকেই দেখেছি আমি। মেয়েটা সুন্দরী, দেখলেই চোখে লাগে, কথা বলত শান্ত ধীর স্বরে, চোখের চাহনী দেখলে লোকে তাকে ম্যাডোনা বলে ভাবত। বৃদ্ধ তাকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে এল, আকর্ষণ এমন হ'ল যে এক মুহূর্ত্ত তাকে ছেড়ে থাকতে পারত না। কন্যা পুত্র-বধূর কাছে এ মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয়নি, কারণ ভালবাসাকে সে পরিবারে সবাই জানত।

অনুরাগ সম্বন্ধে কোন কিছু দেখেই তারা বিস্মিত হ'তনা। যদি তাদের সামনে কেউ বলত বিরহের কথা, বিশ্বাস ঘাতকতায় প্রতিশোধের কথা, সমস্বরে তারা বলে উঠত—"আহা! কত কষ্ট পেয়েই না শেষ পর্য্যন্ত সে এ কাজ করেছে।" ভালবাসার দুর্ঘটনায় তাদের ব্যথা দিত, ভয়ানক অন্যায় দেখেও তারা ক্রুদ্ধ হ'তনা কখনও।

মঁসিয়ে গ্রাভেল নামে এক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল শিকারে। তরুণীকে নিয়ে একদিন সে পালিয়ে গেল। বৃদ্ধ স্যান্টেজ চুপ ক'রে রইলেন যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু একদিন প্রভাতে তাকে কুকুরের ঘরে ঝুলতে দেখা গেল।

ঠিক একই উপায়ে পুত্রেরও মৃত্যু হ'ল, ১৮৪১ সনে প্যারিসে এক হোটেলে। এক অপেরা গায়িকা তাকে প্রতারিত করেছিল।

মরবার সময়ে বার বছর বয়সের এক পুত্র ছিল তার, এবং যে বিধবা

স্ত্রীকে তিনি রেখে যান তিনিই আমার মাসী। বালককে নিয়ে মাসী আমাদের বাড়ীতে এসে থাকেন, আমরা তখন বার্টিলনে, আমার বয়স সতের।

তোমরা ধারণা করতে পারছ না কি অদ্ভুত স্যাণ্টেজ বালক। সবার মনে হ'ত বংশের সমস্ত কোমলতা, সমস্ত উৎসাহ উদ্যম এই বালকের মধ্যে নিহিত আছে। দুর্গ থেকে অরণ্য পর্য্যন্ত একটা পথ ছিল। পথের ধারে এক সারি এল্‌ম গাছ, সেই পথ ধরে বালক একাকি চিন্তামগ্ন চিত্তে ঘুরে বেড়াত। আমার জানালা দিয়ে আমি চেয়ে দেখতাম, বালক ধীর মন্থর গতিতে চলছে, আর কি ভাবছে, হাত দু'খানা পিছনে, মাথাটা নীচের দিকে। এক একবার মাথা তুলে কি দেখছিল। মনে হচ্ছিল সে কিছু বুঝে নিচ্ছে কিন্তু অই বয়সে তা বোঝা সম্ভব নয়।

কোন কোন দিন আহারের পর সন্ধ্যায় সে আমাকে বলত: "বোন্‌, চল আমরা বাইরে গিয়ে ভাবি।" দুই জনে আমরা পার্কে চলে যেতাম। সাদা সাদা মেঘের মধ্য থেকে চাঁদ বাইরে আসত, সমস্ত বনভূমি জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত, আমার হাত খানা টেনে সে বলত: দেখ, দেখ কিন্তু তুমি বুঝছনা আমাকে।

আমি বুঝতে পারছি তা। তুমি যদি আমাকে বুঝতে পারো আমরা সুখী হব। কিন্তু এ জানতে হ'লে ভালবাসা চাই। আমি হেসে বালককে চুম্বন করতাম। বালক উন্মাদের ন্যায় ভালবাসত আমাকে। এক একদিন আহারের পরে বালক আমার মায়ের কোলে গিয়ে বসত: "মাসী, একটা গল্প বলনা, কোন ভালবাসার গল্প।" মা ঠাট্টা করে গল্প বলতেন তাদেরই বংশের কাহিনী। তারই পিতৃপুরুষের ইতিহাস। কত শত গল্প প্রচলিত ছিল—কতক বা সত্য কতক মিথ্যা, ভালবাসার খ্যাতি এবং ভালবাসার জন্য দুঃসাহসিকতাই এদের সবার সর্ব্বনাশের

কারণ। এতে তারা গৌরবান্বিত বোধ করত। সবাই ভাবত বংশের এ সুনাম তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে।

বংশের ইতিহাস এই কোমল এবং ভয়ানক গল্প শুনে বালক গৌরব বোধ করত। এক একবার হাততালি দিয়ে চীৎকার করে উঠত—"আমি—আমিও জানি কি করে ভালবাসতে হয়, তাদের সবার চেয়ে ভাল জানি।"

তারপরে আরম্ভ করল আমাকে প্রেম নিবেদন করতে কোমল অথচ সঙ্কোচিতভাবে। সবাই হাসতে দেখে, সত্যিই এক তামাসার ব্যাপার ছিল সে সবার কাছে। প্রতিদিন প্রাতে ফুল তুলে আনত, আমাকে উপহার দিত। রাত্রে শয়ন কক্ষে যাবার আগে আমার হাত নিয়ে সে চুম্বন করত, অনুচ্চকণ্ঠে এক একবার বলত—"আমি তোমায় ভালবাসি।"

আমি জানি আমি অন্যায় করেছি, আর এজন্য চিরদিনই দুঃখ করে আসছি, চিরদিনই অনুতপ্ত আমি, সমস্ত জীবন ধরে এজন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে। আজীবন কুমারী আমি—অথবা বাগদত্তা বিধবা—তারই বিধবা স্ত্রী।

এই বালক সুলভ চপলতায় আমি আনন্দ অনুভব করতাম, আমি উৎসাহ দিতাম তাকে। ভালবাসার ভান করতাম, একবার প্রশ্রয় দিতাম, তখনই দৃঢ় হতাম আবার। বালককে আমি উন্মাদ করেছিলাম। আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ছিল একটা খেলা, তার মা এবং আমি দুজনেই আমোদ উপভোগ করতাম এতে। তার বয়স তখন বার। একবার ভাব দেখি এই অনু হ'তে অনু—কে তার আবেগকে তখন গুরুতর মনে করতে পারে? যতবার চাইত আমি তাকে চুম্বন করতাম। ছোট ছোট চিঠি লিখতাম তাকে, আমাদের

দুজনেরই মা সে সব পড়তেন। সে আমাকে আবেগপূর্ণ চিঠি লিখত—সেসব চিঠি আমি রেখে দিয়েছি। সে মনে করত সে যুবক তাই ভাবত আমাদের প্রণয় নিবেদনটা গোপনেই হবে। আমরা ভুলে গেছলাম সে শ্যাণ্টেজ।

এক বছর ধরে এই চলেছিল। একদিন সন্ধ্যায় পার্কের মধ্যে সে আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল, উন্মাদের ন্যায় আমার পরিচ্ছদ প্রান্ত চুম্বন করল, বারবার বলতে লাগল—"আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি আমি তোমাকে। যদি আমাকে প্রতারিত করো, যদি অন্য কারও জন্য ত্যাগ করো আমাকে, বাবা যেমন করেছেন তাই করবো আমি।" ভাঙা গলায় সে আমাকে বললে—"তুমি তো জানো কি করেছেন তিনি।"

আমি অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে উঠল, পায়ের আঙুলের উপর ভর করে দাঁড়াল, আমার কানের কাছে মুখ এনে আমার নাম ধরে ডাকল—"জেনেভিভ!" এমন শান্ত, মধুর, কোমল সে স্বর—আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। অতিকষ্টে ধীরে ধীরে বললাম—"চল ফিরে যাই।" কোন কথা না বলে আমার পিছন পিছন সে চলে এল। বারান্দা দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে আবার বললে আমাকে—"বলে রাখছি, যদি কোনদিন ছেড়ে যাও, নিজেকে মেরে ফেলব আমি।"

বুঝলাম অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি আমি। গম্ভীর হয়ে কোন কথার উত্তর দিলাম না। একদিন এজন্য আমাকে সে তিরস্কার করছিল, আমি বললাম—তুমি এখন বড় হয়েছ, তোমার সঙ্গে তামাসা চলেনা। কিন্তু তবুও এত বড় হওনি যে ভালবাসার কথা বলা চলে। আমি অপেক্ষা করে থাকবো।

মনে করেছিলাম এখানেই সমস্ত ব্যাপার শেষ হবে। শরৎকালে সে বোর্ডিং স্কুলে চলে গেল। পরের গ্রীষ্মে সে যখন ফিরে এল আমার বিয়ে তখন ঠিক হয়ে গেছে। এসেই সমস্ত বুঝল সে, এক সপ্তাহ ধরে এমন গম্ভীর হয়ে রইল আমার ভয় হ'ল দেখে।

নয়দিন পরে। ভোরে ঘুম থেকে উঠেছি, দরজার কাছে দেখি এক টুকরা কাগজ। তুলে খুলে পড়লাম—তুমি আমাকে ত্যাগ করেছো। কি বলেছিলাম তোমার মনে আছে হয়ত। তুমি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছ। আমি চাইনা তুমি ছাড়া আর কেউ খুঁজে বা'র আমাকে। তাই গত বছর যেখানে বসে বলেছিলাম "তোমাকে ভালবাসি" সেখানে আসবে এবং উপরের দিকে তাকিয়ে দেখবে।

মনে হ'ল আমি পাগল হয়ে যাব। তাড়াতাড়ি পোষাক পরে তার কথামত সেখানে ছুটে গেলাম। টুপীটা তার মাটির উপর কাদায় পড়ে আছে। সমস্ত রাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। মাথা তুলে দেখলাম পাতার মধ্যে কি যেন ঝুলছে. বাতাস বইছিল প্রচণ্ড বেগে।

জানিনা তারপরে কি করেছি আমি। প্রথম চীৎকার করেছিলাম, তারপরে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছি, তারপরে ছুটে এসেছি বাড়ীর দিকে। জ্ঞান হয়ে দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আমার মা আমার পাশে।

আমার মনে হ'ল সমস্ত ঘটনা যেন স্বপ্ন। অস্ফুট উচ্চারণে বললাম—কি হয়েছে তার? গণ্টরাম কোথায়?

কেউ কোন উত্তর দিলনা! সমস্তই তবে সত্য?

সাহস হ'লনা আর একবার তাকে দেখি। তার সুন্দর চুলের এক গোছা চেয়ে নিলাম আমি। এই যে সেই।

বৃদ্ধা তার কম্পিত হাতখানা প্রসারিত করল। কয়েকবার চোখ মুছল তারপরে আবার বললে—আবার বিয়ে ভেঙে দিলাম, কেন তা

বললাম না কারও কাছে। সারা জীবন ধরে তাই বিধবা আমি। সেই তের বছরের বালকের স্ত্রী।

বৃদ্ধার মাথাটা বুকের কাছে নুয়ে পড়ল, বহুক্ষণ ধরে সে কাঁদল।

অতিথিরা রাত্রের মত বিদায় নিচ্ছিলেন। এক বিশাল বপু ভদ্রলোক এতক্ষণ নীরব ছিলেন—নিকটবর্ত্তীর কানে কানে বললেন—

—"ভাবপ্রবণ হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়, কি বলেন?"



উইল

রেনেস্ত বুর্ণভ্যা যুবক, তাকে চিনি। বেশ অমায়িক লোক, কিন্তু একটু দুঃখিত মনে হয়, কোন কিছুই যেন ভাল লাগেনা তার চোখে, সবই তার কাছে খারাপ, সমস্ত আবরণ যেন এক মুহূর্ত্তে ছিড়ে ফেলবে সে। প্রায়ই তাকে বলতে শোনা যেত—

সৎ লোক নেই, অপেক্ষাকৃত নীচ লোকের সঙ্গে তুলনা করেই তাদের সৎবলা হয়ে থাকে।

দুই ভাই তার, দেখেনি সে তাদের কখনও, বংশ নামে তারা কুর্সী বলে পরিচিত। এই অন্য নাম দেখে মনে করেছিলাম, তাদের পিতা আর একজন। অনেক সময়ে শুনছি এই পরিবারের ইতিহাস একটা অদ্ভুত, রহস্যময়, কিন্তু জানতাম না বিশেষ কিছুই। রেনেকে আমার ভাল লাগত, অল্পদিনের মধ্যেই আমরা দুজনে বন্ধু হয়ে পড়লাম। একদিন সন্ধ্যায় তার ওখানে আহার করছিলাম আমি একাকী, হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি কি প্রথম বিয়ের, না দ্বিতীয় বিয়ের?" একটু বিমর্ষ হ'ল সে, একটু লজ্জিত হ'ল যেন, মনে হল একটু বিব্রত হয়েছে সে। তারপরে শান্ত মলিন হাসি হেসে বললে—

বন্ধু, যদি কিছু মনে না কর, আমার জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি অদ্ভুত কথা শোনাতে পারি তোমাকে। জানি আমি—বুদ্ধিমান তুমি, সুতরাং এজন্য বন্ধুত্ব আমাদের নষ্ট হবেনা, আর যদি নষ্ট হয় তোমাকে বন্ধু বলে পেতেও আর আমি চাইনে।

আমার মা, ম্যাডাম দ্য কুর্সী ছিলেন হতভাগ্য ভীত রমণী। স্বামী তাকে বিয়ে করেছিলেন অর্থের জন্য, সমস্ত জীবন ছিল তার আত্মদানের

ইতিহাস। এই স্নেহময়ী ভীত রমণীর উপর চিরদিনই অত্যাচার করেছে—যার কথা ছিল আমার পিতা হবার। বিয়ের একমাস পরে তার ব্যসনপূর্ণ জীবন আরম্ভ হয়। আপন প্রজা রমণী ও কন্যাদের সঙ্গে সে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত থাকত। তবুও স্ত্রীর গর্ভে তিনটি সন্তান উৎপাদনে এতেও কিন্তু কোন বাধা হয়নি, অবশ্য যদি আমাকে ধর। মা কিছুই বলতেন না। গৃহে নিরীহ ইন্দুরের মত জীবন যাপন করতেন তিনি। ভয়ে ভীত রমণী অবহেলায় সকলের অলক্ষ্যে সবার দিকে তার উজ্জ্বল চঞ্চল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। সে দৃষ্টিতে ছিল ভয়—এ যেন সেই সব জন্তুর মত যারা কিছুতেই ভয়কে তাড়াতে পারেনা। কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন সুন্দরী, খুবই সুন্দরী এবং ফর্সা। সে রংএ একটা মলিনতা এসেছিল, নিরন্তর ভয়ে চুলগুলি যেন তার স্বাভাবিক রং হারিয়ে ফেলেছিল।

মঁসিয়ে কুর্সীর বন্ধুদের মধ্যে যারা তার কাছে আসতেন মঁসিয়ে বুর্ণভ্যা তাদের একজন। বুর্ণভ্যা অবসর প্রাপ্ত অশ্বারোহী সৈনিক, মৃতপত্নীক। সবাই ভয় করত তাকে, দৃঢ় চিত্ত বুর্ণভ্যা ছিল যেমনি ভয়ানক, তেমনি স্নেহশীল। তারই নামে আমার নাম। তিনি লম্বা, পাতলা, তার গোঁফ ছিল কাল মোটা। প্রায় তারই মত হয়েছি আমি। অনেক পড়াশুনা করেছিলেন তিনি। তার মত এবং আদর্শ তার শ্রেণীর অন্যান্য লোকদের মত ছিল না। তার প্রপিতামহী ছিলেন রুসোর বন্ধু, লোকে বলত তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে সেই মতের কতকটা পেয়েছেন। Social Contract তার মুখস্ত ছিল, পুরাতন সংস্কার ও রীতিনীতিকে উল্টে দেবার সমস্ত নীতিও তিনি জানতেন।

মনে হয় তিনি ভাল বাসতেন মাকে, মাও তাকে ভাল বাসতেন। কিন্তু তাদের এ প্রনয় এমন গোপন ছিল যে কেউ সন্দেহ করেনি কিছুই।

উপেক্ষিত, দুঃখী রমণী হতাশ হয়েই বোধ হয় তার সঙ্গে জীবনকে জড়িয়ে ছিলেন এবং এই মেলা মেশার ফলেই পেয়েছিলেন তার কাছ থেকে স্বাধীন চিন্তা, নির্ভীক ভালবাসা। কিন্তু ভয়ে ভীত বলেই মুখ ফুটে বলতে পারেনি কখনও সমস্তই হৃদয়ের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে আবদ্ধ ছিল।

আমার দুই ভাই তাদের বাবার মতই মার উপর অত্যাচার করত, উপেক্ষিত দেখে দেখে কখনও শেখেনি তাকে যত্ন করতে, দাসীর মতই দেখত তারা মাকে। সন্তানদের মধ্যে একমাত্র আমি তাকে ভাল-বাসতাম এবং তিনিও ভালবাসতেন আমাকেই।

যখন তিনি মারা যান আমার বয়স সতের বছর। তোমাকে আর একটা কথা বলা দরকার—বাবার সঙ্গে মার একটা মোকদ্দমা হয়েছিল। মাই জিতেছিলেন তাতে, সম্পত্তির অধিকাংশ তিনিই পেয়েছিলেন। তাছাড়া, আইনের কূটনীতিতে, এবং উকিলের চেষ্টায় তিনি নিজের ইচ্ছামত উইল করবারও অধিকার পেয়েছিলেন। আমরা জানতাম উকিলের বাড়ীতে তার উইল আছে, পড়বার সময় ডাকাও হ'ল সবাইকে। আমার মনে হয় এ সমস্তই কালকার কথা। সেইদৃশ্য মৃত রমণীর বিদ্রোহী আত্মা মুক্তির জন্য ডাকছে যেন, সমস্ত জীবন যন্ত্রণা দিয়েছি তাকে। আজ কবরের মধ্য থেকে মুক্তির জন্য পরিত্রাহী ডাকছে যেন।

যে ব্যক্তিকে লোকে আমার পিতা বলে জানত— শক্তিশালী, কর্কশ, দৃঢ়দেহ ঠিক যেন কসাইএর মত। তিনি এবং আমার দুই ভাই—বয়স একজনের কুড়ি, অন্যের বাইশ চেয়ারে বসেছিল তারা। মঁসিয়ে বুর্ণভ্যাকেও ডাকা হয়েছিল উপস্থিত থাকতে। তিনি এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। বিমর্ষ তিনি, তার কটা গোঁফের আগাটা নিয়ে দাঁত কাটছিলেন। নিঃসন্দেহ তিনি নিজে প্রস্তুত হচ্ছিলেন শুনবার

জন্য সব। উকিল দরজাটাকে আর একবার বন্ধ করল, তারপর মোমদিয়ে আটা খামটা ছিড়ে উইল পড়তে লাগল। তখন পর্য্যন্ত আমরা কেউ জানিনা কি আছে এতে।

বন্ধু এই সময়ে কথা বন্ধ করে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একখানা পুরাতন কাগজ তুলে নিল, তারপরে আবার বলতে লাগল—এই যে সে উইল আমার মার।

আমি—অ্যানি ক্যাথারিন জেনেভিভ ম্যাথিল্ড দ্য ক্রোয়ালিস্ লিও পেণ্ডি জোসেফ গর্ট্রাঁ দ্য কুর্সীয় বৈধ পত্নী, দেহ মনে সুস্থ আমি—আমার শেষ ইচ্ছা জানিয়ে যাচ্ছি।

আমি যা বলতে যাচ্ছি তারজন্য প্রথমেই ক্ষমা চাচ্ছি ভগবানের কাছে তারপরে আমার প্রিয়পুত্র রেনের কাছে। আমার বিশ্বাস আমার পুত্রের অন্তঃকরণ মহৎ, সে বুঝবে আমাকে, আমাকে ক্ষমা করবে সে। সারা জীবন ধরে আমি যন্ত্রণা পেয়েছি। বিবাহের পরেই আমি উপেক্ষিত হয়েছি, স্বামী আমার উপর অত্যাচার করেছে, আমি প্রবঞ্চিত হয়েছি।

আমি তাকে ক্ষমা করছি, কিন্তু তার সম্বন্ধে কোন কর্ত্তব্য নেই আমার। আমার জ্যেষ্ঠপুত্রদ্বয়—একদিনের জন্যও তারা আমাকে ভালবাসেনি, আদর করেনি, একদিনের জন্য আমাকে মার মত দেখেনি তারা। তবুও জীবনে তাদের প্রতি সবরকম কর্ত্তব্য করে গেছি। কিন্তু আমার মৃত্যুর পরে তাদের কিছু পাওনা নেই আমার কাছে। রক্তের বন্ধন দৈনন্দিন স্নেহ ভিন্ন বাঁচতে পারেনা। অকৃতজ্ঞ পুত্র অন্য লোকের চেয়েও পর। সে অপরাধী কারণ মাতার প্রতি উদাসীন হবার কোন অধিকার নেই তার।

লোকের সম্মুখে সর্ব্বদাই আমি ভয়ে কেঁপেছি, তাদের অন্যায় আইন,

অত্যাচারী নীতি এবং লজ্জাকর সংস্কার দেখে। ভগবানের কাছে এখন কোন ভয় নেই আমার। মৃত আমি, আমার আবরণ দূর করে দেই এখন। আমার মনের কথা বলছি, আমার হৃদয়ের গোপন কথা আজ প্রকাশ করছি সবার কাছে।

আইন আমাকে অধিকার দিয়েছে আমার সম্পত্তি যাকে খুসী আমি অর্পণ করব। সাইমন দ্য বুর্ণভ্যা আমার প্রণয়ী এবং রেনে আমাদের পুত্র আমার যা কিছু আছে তাদেরই দিয়ে যাচ্ছি আমি। সব কথা বলছি সেই বিচারকের কাছে যিনি শুনছেন আমার সমস্ত কথা। সেদিন যদি প্রণয়ীর স্নেহ ভালবাসা না পেতাম আমার সমস্ত অস্তিত্বকে, ভগবানের এই সৃষ্টিকে অভিসম্পাত করতাম। তারই বুকের মধ্যে থেকে বুঝেছি আমি ভগবানের এই সৃষ্টি কেবল ভালবাসার জন্য, পরস্পরকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, দুঃখের মুহূর্ত্তে অশ্রুবিসর্জ্জনের জন্য।

মঁসিয়ে কুর্সী আমার প্রথম দুই সন্তানের পিতা। একমাত্র রেনেই তার জীবনের জন্য মঁসিয়ে বুর্ণভ্যার কাছে দায়ী। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি পিতাপুত্রকে তিনি সামাজিক সংস্কার থেকে মুক্ত রাখবেন, আমরণ পরস্পর ভালবাসবে তারা, মৃত্যুর পরে তারা ভালবাসবে আমাকে। এই আমার শেষ চিন্তা, এই আমার শেষ ইচ্ছা।

ম্যাথিল্ড দ্য ক্রোয়ালিস।

মঁসিয়ে কুর্সী উঠে দাঁড়ালেন, চীৎকার করে বললেন—উন্মাদিনী রমণীর এ উইল। মঁসিয়ে বুর্ণভ্যা সম্মুখে অগ্রসর হলেন, উচ্চকণ্ঠে তীক্ষ্ণস্বরে বললেন—

—আমি সাইমন দ্য বুর্ণভ্যা সবার সামনে বলছি এই উইলের প্রতিটি বর্ণ সত্য, আমার নিকট চিঠিপত্র আছে যেসব তা দিয়েই এ প্রমাণ হবে।

মঁসিয়ে কুর্সী এগিয়ে এলেন। মনে হ'ল দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবে এবার। সামনা সামনি দাঁড়ালেন দুজনে। মঁসিয়ে বুর্ণভ্যার দিকে চেয়ে বললেন—নচ্ছার কোথাকার! কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি শুষ্ককণ্ঠে বললেন—এখানে নয়, অন্যত্র দেখা হবে আমাদের। কিন্তু বলে রাখছি, এ জীবনে তাকে তুমি অশেষ যন্ত্রণা দিয়েছ, আমার উচিত ছিল অনেক আগেই তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাই এজন্য।

আমার দিকে ফিরে বললেন—আমার পুত্র তুমি। আসবে কি আমার সঙ্গে? তোমাকে নিয়ে যাবার অধিকার নেই কিন্তু সম্মত হ'লে তোমাকে নিয়েই যাব আমি।

কথা না বলে তার হাত ধরলাম, দুজনে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে।

দুই দিন পরে মঁসিয়ে বুর্ণভ্যা দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মঁসিয়ে কুর্সিকে হত্যা করলেন। আমার ভাইএরা লোকনিন্দার ভয়ে চুপ করে গেল। অর্দ্ধেক সম্পত্তি আমি তাদের দিলাম, তারা ও গ্রহণ করল তা। আইনের প্রতি না চেয়ে আমার যথার্থ পিতার বংশনাম অধিকার করলাম। তিন বছর পরে মঁসিয়ে বুর্ণভ্যার মৃত্যু হয়, আজও আমি শোকার্ত্ত সেজন্য।

চেয়ার থেকে উঠে পড়ল সে, ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বলল—আচ্ছা, আমার মনে হয় মার এই উইল নারীজীবনের এক সুন্দর, মনোজ্ঞ এবং অভিনব কাজ। কি মনে কর তুমি? তার দিকে দুই হাত এগিয়ে দিলাম, বললাম—এতে সন্দেহ কি আছে? আমারও তাই মনে হয়।

মডেল

জুলাইর মধ্যাহ্ন। মাথার উপরে প্রচণ্ড সূর্য্য, নীল সাগরের কোলে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুদ্র এতরতা সহর অষ্টমীর চাঁদের মতই বেঁকে। সাদা সাদা ছোট পাহাড়গুলি খাড়া হ'য়ে আছে বুকের উপর, সমুদ্রের তটভূমিও সাদা।

জলের ধারে বালুর উপর লোকের ভীড় জমেছে স্নানার্থীদের দেখবার জন্য। নৃত্যশালার ছাদে আর একটা ভিড় জমেছে—কেউ বসে আছে, কেউ হাটছে, পরিচ্ছদের জাকজমক ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, মাথার উপর তাদের লাল, নীল নানা রংএর রেশমী ছাতা।

ছাদের শেষ প্রান্তে চলছে শান্ত প্রকৃতির লোকগুলি কোলাহল পূর্ণ জনতা থেকে একটু দূরে।

সুপরিচিত আর্টিষ্ট জিন সামনার চলছে এখানে। বয়স যৌবনের সীমা পার হয়নি কিন্তু মুখশ্রী ক্লান্ত মলিন। পাশেই চাকা দেওয়া একটা চেয়ারে বসেছিল এক যুবতী রমণী, তার স্ত্রী। এক ভৃত্য চেয়ারটাকে ঠেলে নিয়ে চলেছিল। পঙ্গু রমণী ম্লান দৃষ্টিতে আকাশের উজ্জ্বলতার দিকে চেয়েছিল। দেখছিল সে দিবসের আনন্দচ্ছবি, অপরের সুখ ও শান্তির উৎস। তাদের মুখে কথা নেই, পরস্পরের দিকে একবারও তাকায়নি তারা।

যুবতী একবার বললে—এখানে একটু দাঁড়িয়ে নেওয়া যাক না। তারা থামল, ভৃত্য একটা টুল এনে দিল, আর্টিষ্ট তার উপর বসল। যারা পিছনে ছিল এদের দিকে অনুকম্পাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। অনেক কাহিনীই চলে আসছে এদের দুজনের অনুরাগ নিয়ে। সবাই

জানে রমণীর ভালবাসায় মুগ্ধ হ'য়ে তার অঙ্গহীনতা দেখেও আর্টিষ্ট তাকে বিয়ে করেছে।

অনতিদূরে দুইজন যুবক তাদের সম্বন্ধে কথা বলছিল। একটা বেঞ্চের উপর বসে দিগন্তের দিকে চেয়ে ছিল তারা।—না, একথা সত্যি নয়। আমি বলছি জিন সামনারকে আমি ভালই জানি।

—কিন্তু তাহ'লে সে তাকে বিয়ে ক'রল কেন? কারণ পঙ্গু দেখে শুনেই ত বিয়ে করেছে, কি সত্যি নয় কি?

—ঠিকই বলেছ তুমি। হাঁ সে তাকে বিয়ে করেছে—বিয়ে করেছে যেমনি আর দশজনে করে থাকে। এর কারণ সে মূর্খ!

—কিন্তু কেন?

—কিন্তু কেন জিজ্ঞাসা করছ কেন! এর মধ্যে "কেন" নাই। লোকে বোকামী করে কারণ তারা তা করে থাকে। তা ছাড়া তুমি জানো এই আর্টিষ্টেরা বিয়েতে একটু মূর্খতা করেই থাকে। প্রায় সর্ব্বদাই তারা মডেল বিয়ে করে থাকে, এদের সঙ্গে আগেই প্রেমে পড়ে কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই এদের সন্দিগ্ধ স্বভাব বলে লোকে জানে। কিন্তু এরা এ করে কেন? কে জানে? লোকে ভাববে এই মডেলদের সঙ্গে সর্ব্বদা মেলামেশায় এদের প্রতি ঘৃণা এবং বিরক্তি আসবে। কিন্তু মোটেই না। এদের ছবি এঁকে পরে এদেরই বিয়ে করে তারা। আলফোঁস দদের লেখা সেই ছোট্ট বইখানা প'ড়ে দেখো "আর্টিষ্টদের স্ত্রী।" দেখবে কত সত্য, কত নিষ্ঠুর, কত সুন্দর!

অই যে দম্পতিকে দেখছ—দুর্ঘটনা এদের জীবনে এসেছিল এক বিশেষ এবং ভয়ানক ভাবে। স্ত্রীলোকটী এক ভয়ানক তামাসার অবতারণা করেছিল, অথবা একে ট্রাজেডিও বলতে পার। সর্ব্বস্ব অধিকার করতে গিয়ে সে সর্ব্বস্ব বিপদাপন্ন করেছিল। কিন্তু এতে

কি সরলতা ছিল তার? সে কি জিন্‌কে ভালবাসত? কিন্তু কি করে জানবো সে কথা? কে জানে কোনোদিন জানবো কিনা। কে জানে মেয়েদের কতখানি কৃত্রিম, আর কতখানি বাস্তব? বাধা বন্ধহীন আবেগের বেলা তারা খুবই সরল। আবেগের জন্য তারা ভয়ানক হতে পারে, ভীষণ অন্যায় করতে পারে, আবার একান্ত বিনীত, শ্রদ্ধাভাজন হতে পারে আবার যে কোন হীন কাজও করতে পারে। অকারণেই অনবরত মিথ্যা বলছে তারা, কেন বলছে নিজেরাই জানেনা, কিন্তু এ সত্ত্বেও আবেগ ও অনুভূতির ব্যাপারে তারা খুবই সরল। এমন ভয়ানক অপ্রত্যাশিত, দুর্বোধ্য এবং নির্ব্বুদ্ধিতা দিয়ে এ প্রকাশ করে যে আমাদের সমস্ত তর্ক, আমাদের সমস্ত প্লানকে উল্টে দিয়ে থাকে। আগে বোঝা যায়না, সঙ্কল্প তাদের এমন হঠাৎ সামনে এসে পড়ে যে আমাদের কাছে তা দুর্বোধ্য ধাঁধা বলেই মনে হয়। সর্ব্বদা নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি—তারা কি সরল না ভান করছে?

কিন্তু আমি বলছি বন্ধু, তারা সরল এবং কপট দুইই। কারণ তাদের স্বভাবই তাদের চরমে নিয়ে যায়—দুই ক্ষেত্রেই।

তাদের মধ্যে ভাল যে তাকেই কেন দেখনা, নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে সে কি ক'রে থাকে। তাদের এ উপায় সরল এবং জটিল দুইই। এত জটিল যে আগে আমরা এ বুঝতেই পারিনা, আবার এত সরল সে তাদের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করে তারপর ভাবি—কি? এত সহজে সে বোকা বানিয়ে দিলে আমাকে?

আর সব সময়ই তারা নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করেই নেয় বিশেষ বিয়ে সম্বন্ধে। এখন সামনারের গল্প বলছি, শোন:

বুঝতেই পারছো এই মেয়েলোকটি ছিল মডেল। আর্টিষ্টের সামনে বসত সে। স্ত্রীলোকটী সুন্দরী, আড়ম্বরপ্রিয়, দেখে মনে হ'ত স্বর্গীয়

সৌন্দর্য্য শ্রীমণ্ডিত সে দেহ। আর্টিষ্টের মনে হ'ত সে তাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসে। এই আর একটি অদ্ভুত। যখনই কেউ কোন স্ত্রীলোককে দেখে মুগ্ধ হয় তখনই ভাবে একে ছাড়া তার বাকী জীবন চলবে না আর। সবাই জানে এর আগেও তারা বহুবার এমনি ভেবেছে প্রতিবারেই বিরক্তি এসেছে তাদের। পাশাপাশি দুইটী জীবনযাপনের জন্য অন্তরের সঙ্গে অন্তরের সহানুভূতি, চরিত্র এবং স্বভাবের মিলন। এই মোহের মধ্যেও তাকে বুঝতে হবে একি তার দেহের ক্ষুধা, না দেহাতীত আকাঙ্ক্ষা।

আর্টিষ্টের মনে হল সে তাকে ভালবাসে। কত বিশ্বস্ততার শপথ করলে সে, তার প্রতি বিশ্বস্তই সে ছিল।

সত্যই রমণী সুন্দরী, যে চঞ্চলতা এবং বাক পটুতা প্যারীর যুবকদের মুগ্ধ করে তা তার আছে। কখনো হড়বড় করে, কখনো অনর্থক বাচালতা করে, কখনো নির্বোধের মত মন্তব্য প্রকাশ করে কিন্তু বলিবার ভঙ্গিতে তা বুদ্ধির পরিচয় বলেই ভ্রম হয়। তার ভাবভঙ্গী আর্টিষ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সে হাত তোলে, নত হয়, গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে, হাতখানা তোমার দিকে বাড়িয়ে দেয়, গতিভঙ্গী সর্ব্বত্রই সুন্দর, দেখেই বলবে— হাঁ, এই ঠিক।

তিনমাস পর্য্যন্ত জিনের একবারও মনে হয়নি আর মডেলের মতই সে।

গ্রীষ্ম কাটাবার জন্য রমণীকে আন্দ্রেসীতে একখানা ছোট বাড়ী ভাড়া ক'রে দিলে।

আমি তখন সেখানে, প্রথম যেদিন বন্ধুর মনে সন্দেহ জাগল।

সুন্দর সন্ধ্যা, আমরা ভাবলাম নদীর ধারে একটু ঘুরে আসব। মৃদু

কম্পিত নদীর বুকে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছিল, স্রোতের সঙ্গে ঢেউএর উপর নেচে নেচে চলছিল সোনালী রশ্মিগুলি, উদার উন্মুক্ত নদীবক্ষে সর্ব্বত্রই।

নদীর পার ধরে আমরা চলছিলাম, স্বপ্নিল সন্ধ্যা একটা আনমনা ভাব এনে দিয়েছিল আমাদের মধ্যে। ভাবছিলাম অভাবনীয় কিছু করে ফেলব, কোন অজ্ঞাত কাব্যসুন্দরীকে ভাল বাসব। আনন্দের বান ডেকেছিল আমাদের অন্তরের মধ্যে, কত ইচ্ছা, কত আকাঙ্ক্ষা। সবাই আমরা নীরব। রাত্রির জীবন্ত শীতলতার মধ্যে আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব যেন ডুবে গেছে, শান্ত শীতল চন্দ্র কিরণ আমাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে, আমাদের অন্তরাত্মাকে তন্ময় করে দিয়েছে, সৌরভে, সুগন্ধের মধ্যদিয়ে অনন্ত সুখে ডুবিয়ে দিয়েছে আমাদের।

হঠাৎ জোসেফাইন চীৎকার করে উঠল, এই তার নাম—

—দেখেছ কত বড় মাছটা লাফিয়ে পড়ল ওদিকে।

সেই দিকে লক্ষ্য না করে, কিছু না বুঝেই আর্টিষ্ট উত্তর দিল—

—হাঁ, দেখেছি।

রমণী ক্রুদ্ধ হ'ল।

—না, বলছি আমি, দেখনি তুমি। তুমি তখন পিছন ফিরে ছিলে।

বন্ধু হাসল।

—হাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি, দেখছ কি সুন্দর! আর কিছুই ভাবিনি আমি।

রমণী এক মুহূর্ত্তের জন্য নীরব রইল, মনে হ'ল সে কিছু বলবে—

—কাল তুমি প্যারিস যাবে?

বন্ধু উত্তর করল—জানিনা।

রমণী আবার বিরক্ত হ'ল।

—তুমি কি ভাবছো কোন কথা না বলে এইভাবে চলা খুব ভালো ?

আর্টিষ্ট কোন উত্তর দিলনা। রমণীসুলভ স্বাভাবিক বুদ্ধিতে জোসেফাইন বুঝল আর্টিষ্ট রেগেছে। নারীকণ্ঠে সে গান ধরল—"তোমায় দেখব আমি কোন আকাশে" গত দুই বছর এই স্বর আমাদের মন এবং কানকে বিরক্ত করেছে।

বন্ধু বিরক্ত হয়ে বললে—একটু চুপ করবে দয়া করে ?

ক্রুদ্ধ হয়ে রমণী উত্তর দিল—কেন আমাকে চুপ করতে বলছ ?

বন্ধু উত্তর করল—কারণ সমস্ত দৃশ্যটা তুমি মাটি করছ।

তারপরে যে দৃশ্য আরম্ভ হ'ল—ঝগড়া, ভৎ´সনা, গালাগালি শেষ পর্য্যন্ত চোখের জল। বলতে বাকী কিছুই ছিলনা, বাড়ীতে তারা ফিরে এল। রমণী একাই কথা বলছে, বন্ধু দৃশ্য দেখতেই মগ্ন ছিল। একটী কথারও উত্তর করেনি সে, এই ভৎ´সনার বন্যায় সে দিশেহারা হয়ে গেছল।

তিন মাস পরে বন্ধুর আপ্রাণ চেষ্টা হ'ল এই অদৃশ্য এবং দুর্ভেদ্য বন্ধুত্বের শৃঙ্খলকে কি করে ছিড়ে ফেলবে। রমণীর প্রভাব তার জীবনে অসহ্য, রমণীর অত্যাচার সে তীব্রভাবে অনুভব করত, জীবন তার কাছে দুর্ব্বিসহ হ'য়ে উঠল। দিনরাত তারা ঝগড়া করত, পরস্পর গালাগালি করত, কোন কোন দিন মারামারিতে সমাপ্ত হত।

যে প্রকারেই হোক্ তাদের এ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া চাই। বন্ধু তার সমস্ত ক্যানভাস বিক্রি করে ফেলল, বন্ধুদের নিকট টাকা ধার নিল। বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক জমা হ'ল এইভাবে। একদিন ভোরে একখানা চিঠি লিখে এবং তারসঙ্গে এই টাকাটা রেখে বন্ধু চলে এল আমার কাছে।

তিনটার সময়ে দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। আমি বাইরে এলাম।

আমাকে পাশে ঠেলে এক রমণী ভিতরে প্রবেশ করল। এই সেই! রমণীকে দেখে বন্ধু উঠে দাঁড়াল।

রমণী ব্যাঙ্ক নোট সহ এনভেলোপটা তার পায়ের কাছে ছুড়ে ফেলে দিল, এক যথার্থ মহৎ ভঙ্গী নিয়ে বলল—

—"এই তোমার অর্থ, এ চাইনা আমি।"

তার মুখশ্রী খুবই মলিন, দেখলাম সে কাঁপছে। বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখলাম বিমর্ষতা এসে তাকেও ঘিরে ধরেছে, ক্রোধে, বিরক্তিতে সে ক্লান্ত, এ অবস্থায় যে কোন অন্যায়ই সম্ভব তাকে দিয়ে।

সে জিজ্ঞাসা করল—কি চাও তুমি ?

রমণী উত্তর করল—তোমার কাছে আমি সাধারণ মেয়েদের মতো ব্যবহার চাইনা। তুমিই প্রার্থনা জানিয়েছিলে তোমাকে গ্রহণ করতে কিন্তু তোমার কাছে কিছুই চাইনি। আমি থাকবো তোমার কাছে।

—না, এ তোমার অন্যায় দাবী। যদি মনে করো—

আমি তাকে ধরলাম—অত অধীর হওনা জিন। সব ঠিক করে দিচ্ছি আমি।

ধীরে ধীরে রমণীর কাছে গেলাম, তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু একে একে সমস্ত যুক্তি ফুরিয়ে গেল। রমণী নীরব নিস্তব্ধ চেয়ে রইল আমার দিকে, কোন কথা বুঝল না, একটা কথার উত্তর দিলনা।

এরপরে আর কি বলা যায় ? আমি শেষ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলাম—

—ও তোমাকে এখনও ঠিকই ভালবাসে কিন্তু ওর পরিবার চায় ও আর একজনকে বিয়ে করুক এবং তুমি হয়ত বুঝবে—

রমণীর সমস্ত দেহ কেঁপে উঠল, সে চীৎকার করে উঠল—

আ! এবার বুঝেছি আমি।

বন্ধুর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল—তাহ'লে তুমি বিয়ে করছ ?

বন্ধু স্থির ভাবে বললে—হাঁ।

সে আর একটু এগিয়ে এল।

—যদি বিয়ে করো আমি আত্ম হত্যা করব। শুনছ তুমি?

বন্ধু সেদিকে না ফিরেই বললে—আত্মহত্যা করবে তার আমাকে কি করতে বল?

রমণী বিড় বিড় করে কি বলল, সমস্ত কণ্ঠ তার আবেগে রুদ্ধ হ'ল।

—কি বলছ তুমি? কি বলছ? বল, বল কি বলছ? আর একবার বল।

বন্ধু পুনরায় বলল—আত্মহত্যা করবে করনা।

সমস্ত মুখ তার বিবর্ণ হয়ে গেল, সে উত্তর করল—

এমন কথা বলতে পারলে? এই জানালা থেকে লাফিয়ে পড়ব আমি।

বন্ধু হাসতে লাগল, ধীরে ধীরে জানালার কাছে গিয়ে টেনে খুলে দিলে সেটা—

—এই যে নাও।

এক মুহূর্ত্ত সে তার দিকে চাইল উগ্র ভয়ানক দৃষ্টিতে। তারপরে আমাকে এবং তাকে পার হ'য়ে ছুটে এল সে। জানালার উপর লাফিয়ে উঠল এবং তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

মনের সে অবস্থার কথা ভুলবনা আমি। দেখলাম জানালার উপর থেকে দেহটা মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে একবার দেখেই পিছিয়ে গেলাম, সাহস হ'লনা আর একবার দেখি। মনে হ'ল এখনই পড়ে যাব।

হতভম্ব তিন নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

নীচ থেকে রমণীকে উপরে নিয়ে আসা হ'ল, কিন্তু দুই পা ভেঙ্গে গেছে তার। আর কখনও সে চলবে না।

জিন দুঃখিত হ'ল, অনুতপ্ত হ'ল, এ দৃশ্য স্পর্শ করল তাকে। সে মনস্থ করল তাকে বিয়ে করবে।

তাই অই দেখছ তাকে। বুঝলে এবার?

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। রমণী ঠাণ্ডা অনুভব করল। সে গৃহে যেতে চাইল, ভৃত্য চেয়ারটাকে গ্রামের দিকে ঘুরিয়ে দিল। আর্টিষ্ট স্ত্রীর পাশেই চলছিল, একঘণ্টা পর্য্যন্ত তাদের কোন কথা হয়নি।

সমাপ্ত